সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জুলাই-অগাস্ট ২০১৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

শিক্ষা, সাক্ষরতা ও সনদপত্র

জাপানের একটি গ্রামে একদিন

বাংলাদেশের পানিসম্পদ

সুকুমার রায়ের লেখা সূর্যের কথা

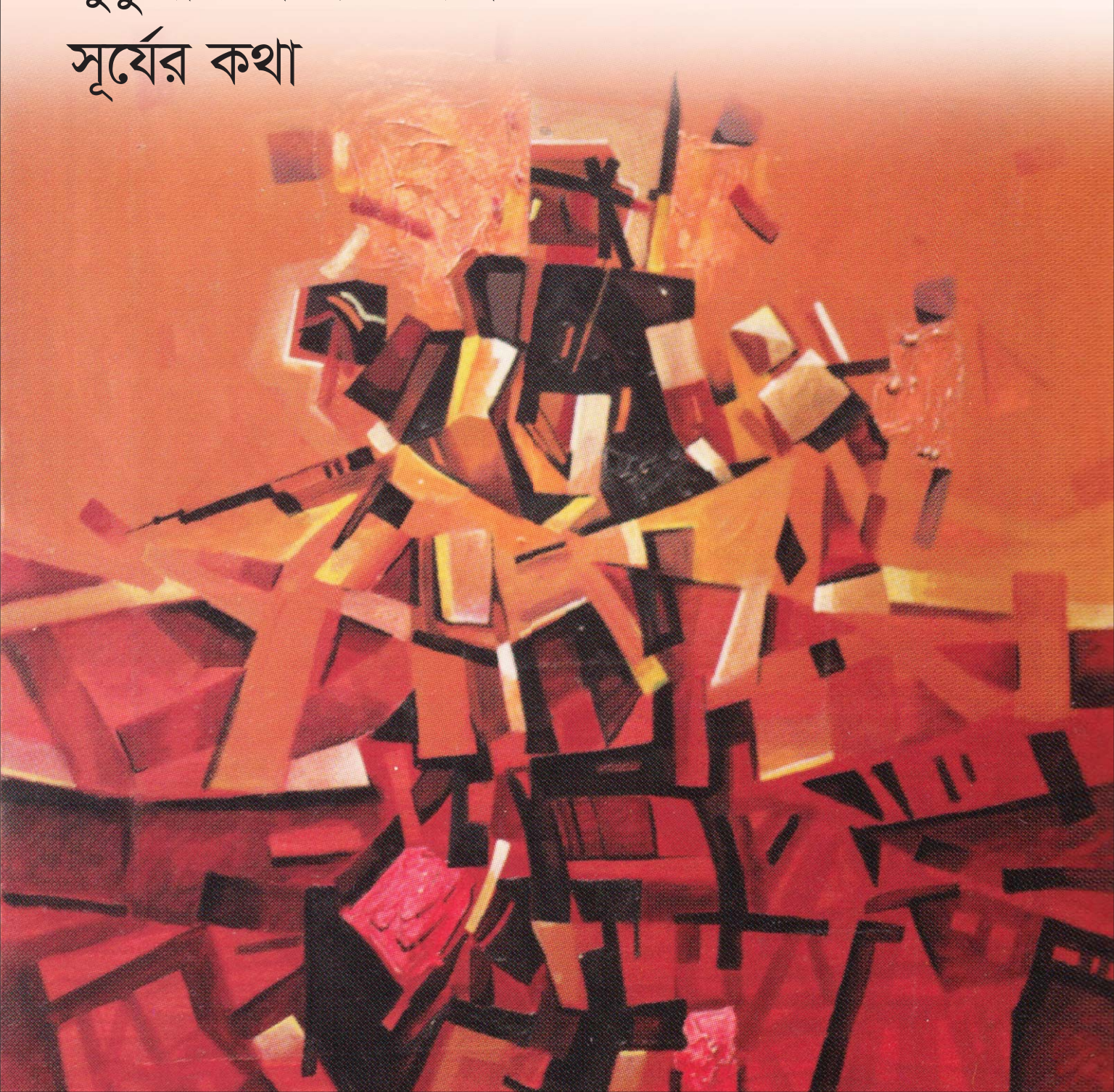

শিক্ষালোক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

জুলাই-অগাস্ট ২০১৫ ● ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য সর্বজনীন শিক্ষা অপরিহার্য। অবশ্যই যেনতেন প্রকারের নয়, প্রকৃত শিক্ষা হতে হবে। শুধু সাক্ষরতা, সনদপত্র ও পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জনের মাধ্যমে চাকুরি পাওয়া নয়, প্রয়োজন প্রকৃত নৈতিকতাসমৃদ্ধ শিক্ষালাভের মাধ্যমে সমাজে কল্যাণকর ভূমিকা রাখা। সেজন্য শিক্ষা, সাক্ষরতা ও সনদপত্রের মধ্যে সম্পর্ক কি এবং আমাদের বৃহৎ লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এবার আমরা এ বিষয়ক একটি লেখার অবতারণা করেছি যাতে এ সম্পর্কে আরো ভাবনা-চিন্তা ও তর্কবিতর্ক ওঠে।

চলতি সংখ্যায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সুকুমার রায়ের একটি অত্যন্ত সহজবোধ্য আকর্ষণীয় লেখা প্রকাশ করেছি। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর হাস্য-রসাত্মক জীবনঘনিষ্ঠ ছড়া-গল্প বয়স নির্বিশেষে সবার কাছে এখনও কত প্রিয়। আশা এই যে, সূর্য নিয়ে তাঁর এ লেখাটি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চায় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। যদি মাতৃভাষায় উচ্চ চিন্তাসমূহ আত্মস্থ করা না যায়, তবে শিক্ষার নামে পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া কিছু হবে না।

শিক্ষালোক আমাদের সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক একটি বুলেটিন হলেও বৃত্তের বাইরের মহলকেও আমরা আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি।

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদের ছবি
নো মোর ওয়ার, সেভ হিউম্যানিটি
রফিক সিদ্দিকী

ডিজাইন ও মুদ্রণ : ইনফ্রা-রেড | ফোন: ৯১২১৪৭২

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

সুকুমার রায়ের লেখা

সূর্যের কথা

শিশুসাহিত্যিক বলে বেশি পরিচিত সুকুমার রায় (১৮৮৭ - ১৯২৩) সূক্ষ্ম হাস্যরসাত্মক ও সমাজসচেতন লেখায় সিদ্ধহস্ত। কবিতা, গল্প, নাটক ইত্যাদি বহু কিছুতে তাঁর অবদান রয়েছে। আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল, বহুরূপী, খাই খাই, অবাক জলপান, শব্দকল্পদ্রুম ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনাসমূহের কয়েকটি। উল্লেখ্য, প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পিতা ও বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর পুত্র। তাঁদের আদি নিবাস বাংলাদেশের ময়মনসিংহে।

আমরা তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক এ লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করছি। এত আগের রচনা হওয়া সত্ত্বেও এটিকে খুবই নতুন মনে হয়। বাংলা ভাষায় কিভাবে সহজে বিজ্ঞান চর্চা হতে পারে আমাদের সৃষ্টিশীল মানুষেরা তা দেখিয়েছেন। এ লেখায়ও তার স্পষ্ট ছাপ আছে। কিন্তু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় আমরা এখনও আশ্চর্যরকম পিছিয়ে রয়েছি।

সূর্যটা একটা গোল আগুনের পিণ্ড, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গোল, সেটা চোখেই দেখতে পারি – আর 'আগুন' কিনা তা একটিবার দুপুর রোদে দাঁড়ালেই আর বুঝতে দেরি লাগে না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই পৃথিবীটার মতো তেরো লক্ষ পিণ্ডের তাল পাকালে তবে এই সূর্যের সমান বড় হয়। তাঁরা কেমন করে জানলেন? যাঁরা জরিপ করেন তাঁরা জানেন, খুব দূরের জিনিসকে নানারকমে পরখ করে এমন হিসাব পাওয়া যায় যা থেকে চট্ করে বলা যায় যে জিনিসটা কতখানি দূরে! এই কৌশলটি পণ্ডিতেরা সূর্যের উপর খাটিয়েছেন। পৃথিবীর দুই জায়গায় দুইজন লোক বসে সূর্যটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন্ সময়ে সেটাকে আকাশের ঠিক কোন্ জায়গায় দেখা যায় – এবং দুজনের হিসাব মিলিয়ে অঙ্ক কষে বলেছেন যে সূর্যটা এখান থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। সে যে কতদূর তা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। একটা এঞ্জিন যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল করে ক্রমাগত ছুটে আজ থেকে সূর্যের দিকে রওনা হয়, সে ১৭৭ বছর পরে (২০৯৩

খৃষ্টাব্দে) সূর্যে গিয়ে পৌঁছবে। পণ্ডিতেরা এইসকল মাপ নিয়ে বলেছেন যে ঐ সূর্যের পাশে পৃথিবীটাকে বসালে সেটা দেখাবে যেন একটি তরমুজের পাশে একটি মুসুরির ডাল।

সূর্যটা কিসের তৈরি? সূর্যের আলোক পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীটা যা দিয়ে তৈরি সূর্যটাও ঠিক তাই দিয়েই তৈরি। তবে, সেইসব মাল-মসলা জমে এখানে যেমন জল মাটি পাথর হয়েছে সেখানে তা হবার যো নেই – কারণ, সেখানকার সর্বনেশে গরমে সব জিনিস সত্য সত্যই আগুন হয়ে ওঠে। লোহা শুধু গলে যায় তা নয়, ফুটন্ত জলের মতো টগ্‌বগ্ করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এই ফুটন্ত আগুন আর জ্বলন্ত বাষ্প সূর্যের চারিদিক ঘিরে লক্‌লক্ করতে থাকে। শুধু চোখে মনে হয় সূর্যটা একটি মোলায়েম গোল জিনিস, তার গায়ে কোথাও আঁচড়ের দাগটি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল দূরবীন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, তার সমস্ত গা ভরে আগুনের চিক্‌মিক্ খেলছে – আগুনের সমুদ্রে আগুনের ঢেউ, তার মধ্যে বড় বড় আগুনের ডেলা পাগলের মতো ডুবছে আর ভাসছে। তাছাড়া সূর্যের গায়ে প্রায়ই ছোট বড় ফোসকা দেখা যায় – ফোসকাগুলি তত উজ্জ্বল নয়, তাই দেখতে হঠাৎ কালো দেখায়। জলের মধ্যে যেমন বুদবুদ ওঠে সূর্যের গায়ে তেমনি আগুনের ফোসকা ওঠে আর ফেটে পড়ে। এক একটি বুদবুদ মাঝে মাঝে এত বড় হয় যে, কালো কাচ দিয়ে দেখলে সেগুলোকে শুধু চোখেই দেখতে পার। ঐরকম এক একটা বুদবুদের মধ্যে ইচ্ছে করলে, দু-দশটা পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে পুরে রাখা যায়। ঐ ফোসকাগুলি এক একটি আগুনের ঘূর্ণিচক্র, তার চারিদিকে দম্‌কা আগুন ঠেলে উঠছে।

সূর্যের তেজ এত বেশি যে তার চারিদিকে যে আগুনের শিখা ঝড়ের মতো উঠছে আর পড়ছে, সেগুলি আমরা দেখতেই পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণগ্রহণ হয়, চাঁদটা মাঝে পড়ে তার চক্‌চকে শরীরটা আড়াল করে ফেলে, তখন তাদের চেহারা দেখা যায় আগুনের লক্‌লকে জিভের মতো। শিখাগুলি হাজার হাজার মাইল জুড়ে দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে, কখন আগুনের ঝাপটা দিয়ে মিনিটে ছয় হাজার মাইল ছুটে যায়, কখন শান্ত মেঘের মতো সূর্যের গায়ে ভেসে বেড়ায়। এক একটাকে দেখে মনে হয় যেন আগুনের ফোয়ারা উঠছে। তার মধ্যে যদি আমাদের এই পৃথিবীটাকে ছেড়ে দাও একটি চক্ষের নিমেষে গলে বাষ্প হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে যাবে সে আর খুঁজেই পাবে না। সূর্যের চারিদিকের এই অগ্নিমেঘের স্তরটিকে দিনের আলোতে দেখবার জন্য পণ্ডিতেরা আশ্চর্যরকম উপায় বার করেছেন, তার জন্য তাঁদের এখন আর গ্রহণের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

কিন্তু সূর্যের চারিদিকে আরো একটি জিনিস আছে যেটিকে গ্রহণ ছাড়া দেখবার যো নেই – সেটিকে সূর্যের কিরীট (Corona) বলা যায়। পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বাতাসের আবরণ সূর্যের চারিদিকেও তেমনি বহুদূর পর্যন্ত এই কিরীটের ঢাকনি। যাঁরা সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখেছেন তাঁরা বলেন, এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য আর কিছু নেই। যখন গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চাঁদের কালো ছায়া যখন চোখের সামনে পাহাড় সমুদ্র সব গ্রাস করে ফেলতে থাকে, আকাশের অদ্ভুত ফ্যাকাসে রং আর পৃথিবীর অন্ধকার দেখে, পশু পাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়; সেই সময়ে সূর্যের তেজ চাপা পড়ে তার আশ্চর্য কিরীটের শোভা দেখা যায়। শুধু এই কিরীটের সুন্দর স্নিগ্ধ আলো দেখবার জন্যই কত লোকে পয়সাকড়ি খরচ করে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে গ্রহণ দেখতে যায়। এই কিরীটের চেহারা সব সময়ে এক রকমের থাকে না – কখন সেটা চারিদিকে বেশ সমানভাবে গোল হয়ে থাকে, কখন তার মধ্যে ভয়ানক ঝড় ঝাপটার লক্ষণ দেখা যায় – কখন তা থেকে লম্বা লম্বা ছটা বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মোটের উপর বলা যায়, যে সময়ে সূর্যের গায়ে ফোসকা বেশি দেখা যায় সেই সময়ে তার আগুনের শিখাগুলিরও অত্যাচার বাড়ে, আর সেই অত্যাচারে তার কিরীটটিকেও ঘাঁটিয়ে তোলপাড় করে তোলে। আমরা জানি যে পৃথিবীটা ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়, তাতেই আমাদের দিনরাত হয়। সূর্যটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেও ভয়ংকর বেগে লাট্টুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে – কিন্তু একটি পাক খেতে তার ছাব্বিশ দিন সময় লাগে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, সূর্যটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে – কিন্তু পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সবাই মিলে ঘুরতে ঘুরতে তার চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু আসলে তা নয় – বিশ্বজগতে কারও স্থির হয়ে বসে থাকবার হুকুম নেই। আমাদের এই পৃথিবী এবং আর সমস্ত গ্রহকে নিয়ে সূর্য ভয়ানক বেগে শূন্যে ছুটে চলেছে। সে কোনদিকে কিরকম বেগে চলছে, তাও পণ্ডিতেরা হিসাব করে ঠিক করেছেন। এই হিসাবে সূর্য ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি হাজার মাইল পথ ছুটে চলেছে।

শুনলে হঠাৎ হয়তো মনে হতে পারে, এমন সাংঘাতিক চলতে গিয়ে হয়ত কোন্‌দিন কোন্ তারার সঙ্গে তার ঢুঁ লেগে যাবে – কিন্তু সেরকম ভয়ের কোন কারণ নেই। এইসব তারাগুলি এক একটি এত দূরে যে সূর্যটা দশ লক্ষ বৎসর এইভাবে ছুটলেও কোন তারার কাছে পৌঁছাবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা হিসাব করে দেখ – এক ঘণ্টায় যদি ২০০০০ মাইল যাওয়া যায় তাহলে দশ লক্ষ বৎসরে কত মাইল? ২০০০০ X ২৪ X ৩৬৫ X ১০০০০০০। তাহলে এক একটি তারা কতখানি দূরে একবার ভাবতে চেষ্টা কর।

শিক্ষা, সাক্ষরতা ও সনদপত্র

আলমগীর খান

শিক্ষা ও সাক্ষরতা এক নয়। কথাটা ঘুরিয়ে বললে, অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা এক নয়। শিক্ষা ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক, সাক্ষরতা যার ছোট্ট একটা ভগ্নাংশ মাত্র। এ ভগ্নাংশটুকু বাদ দিয়েও একজন অতি বড় মাপের শিক্ষিত ব্যক্তি হতে পারেন। ইতিহাসের পাতা এমন বহু জ্ঞানী-গুণী-মহৎ মানুষের নামে ভরা। আমাদের দেশে সচরাচর যাকে শিক্ষিতের হার বলে, আসলে তা সাক্ষরতার হার। বড়লোক ও টাকাওয়ালার মধ্যেও এমনিভাবে অর্থকে লেজেগোবরে করে ফেলা হয়। বড়লোক বলতে বড় মনের মানুষ বোঝানো উচিত যিনি বিত্তহীনও হতে পারেন। আবার একজন অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি খুবই ছোট মনের মানুষ বা ছোটলোক হতে পারে। ছোটলোক ও গরিব মানুষের মধ্যেও এরকম অর্থ লেজেগোবরে করে ফেলা হয়।

আসলে মানুষ নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু একজন সুস্থ দেহমনের মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। সমাজ মানুষকে হাঁটতে, কাপড় পরতে, আগুন ব্যবহার করতে ও কথা বলতে শেখায়। এ যে কী বিরাট শিক্ষা তা সমাজকে অনুপস্থিত কল্পনা করলে মনের চোখে খানিক আন্দাজ করা যেতে পারে। জন্মের পর থেকে একা বনে বাস করা একটা শিশু উপরের চারটির মধ্যে কোনটিই শিখতে পারবে না। তাছাড়া পরিবার শিশুকে শেখায়। যে শিশু কোনদিন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, অথচ জমিতে লাঙল দিতে শিখেছে বা নদীতে মাছ ধরতে শিখেছে বা দোকানে হিসাব করতে শিখেছে, এরকম আরো কত কাজ, যা দিয়ে সে আত্মনির্ভরশীল ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করে তাকে নিরক্ষর বলা গেলেও অশিক্ষিত বলার অধিকার কারো নেই। যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত কর্মকর্তা কোনো অপরাধ করে ধরা পড়ার কারণে এখন শুধু বসে বসে রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে বেতন নেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন, তেমন পরজীবী সম্মানীয় ব্যক্তিদের চেয়ে কি ওই স্বাবলম্বী শিশু বা কিশোরটি বেশি সম্মানীয় ও শিক্ষিত নয়? দুজনের মধ্যে আকাশপাতাল ভেদ তৈরি করেছে সনদপত্র নামের রাষ্ট্র-স্বীকৃত এক টুকরো কাগজ যা একজনকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যজনের নেই।

সাক্ষরতা বা অক্ষরজ্ঞান আসলে কি? এ কোনো জ্ঞান নয়, একটি দক্ষতা, একটি হাতিয়ারের মালিকানা। চোখ বা কান থাকা জ্ঞান লাভ করা নয়, কিন্তু জ্ঞানের হাওয়া ঢোকার দরজা। এসব দরজা ছাড়াও অন্য দরজার সাহায্যেও মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। চোখ-কানওয়ালা কিন্তু অন্ধ-বধির মানুষ, আবার অন্ধ কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হরহামেশাই জগতে জন্ম নেন। তবু চোখ ও কান দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির যে সুবিধা দেয়, তা অপরিমেয়। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা এরূপ যেকোনো একটি শক্তির অভাবেই দুঃসহ জীবনযাপনে বাধ্য। অক্ষরজ্ঞান তেমনি আরেক জোড়া বাড়তি চোখ বা কান বা হাতিয়ার। সামান্য অক্ষরজ্ঞান না হলে আধুনিক কালে জীবনযাপন ও চলাফেরা করা যায় না বললেই চলে। সাক্ষরতা তাই সমাজ-রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য খুবই জরুরি।

নিজের অধিকার রক্ষা করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ চোখ-কানের মতো অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। শিশু যাতে সুস্থ চোখ নিয়ে বড় হতে পারে, সেজন্য সরকারি উদ্যোগে সারাদেশে স্কুলে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো হয়। চোখের সামনের চোখের জন্য যে আয়োজন, চোখের আড়ালের চোখের জন্য আরো বড় উদ্যোগ প্রয়োজন। একইভাবে হাতপা শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য শিশুকে পোলিও-টিকা খাওয়ানো হয়। ভিটামিনের ও টিকার অভাবে শিশুর যে ক্ষতি হয়, অক্ষরজ্ঞানের অভাবেও একইরূপ ক্ষতি হয়। শিশুর মনে কোনো না কোনো অঙ্গহানি ঘটে যায়। কোনো ক্ষতিই শুদ্ধ বক্তিগত ও পারিবারিক নয়, জাতীয়।

আসলে মানুষ নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু একজন সুস্থ দেহমনের মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। সমাজ মানুষকে হাঁটতে, কাপড় পরতে, আগুন ব্যবহার করতে ও কথা বলতে শেখায়। এ যে কী বিরাট শিক্ষা তা সমাজকে অনুপস্থিত কল্পনা করলে মনের চোখে খানিক আন্দাজ করা যেতে পারে

তাই প্রত্যেক নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। শিক্ষা বা সাক্ষরতা মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের একটি বলতে এটাই বোঝায়। আমাদের রাষ্ট্রও সংবিধানে এরকম একটি দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। আধুনিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই তার উপযুক্ত বয়সের শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? এতদিন এদেশে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বলে গণ্য করা হতো। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতিতে তা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হয়েছে। এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ। আসল কথা হচ্ছে শিশু কী শিখছে। একটি শিশু

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে বলা যাবে যদি সে কেবল পড়তে, লিখতে ও গুণতে পারে। ইংরেজের জগতে রিডিং, রাইটিং ও অ্যারিথমেটিক এই তিন শব্দের সামান্য 'আর' নিয়ে অসামান্য 'তিন আর' (থ্রি আর-স) বানানো হয়েছে। আমাদের 'পড়ালেখা' বা 'লেখাপড়া' কথাটাও খানিক ঐ ধাঁচের – অর্থাৎ পড়তে ও লিখতে পারা। আমরা শিশুর পড়া, লেখা ও গণনার ক্ষমতাকে আরো সংক্ষেপ করে বলতে পারি, কেউ যদি তার মনের কথা মাতৃভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারে তাহলেই সে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে। মনের কথা লিখে প্রকাশ করতে গেলে পড়া ও গণনার যোগ্যতা আপনি এসে পড়ে। এই সামান্য 'মনের কথা নিজ ভাষায় লিখতে পারা' দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞা অনেক সঠিক, সহজ ও কার্যকরী।

কথা বলতে পারা ও হাঁটতে পারা যেমন মানবশিশুর মৌলিক অধিকার, লিখতে পারাও আধুনিক মানবশিশুর জন্য তাই। ধনী-গরিব, উচ্চ-নিচ, ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সব শিশুকেই এ শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব সমাজের। কখনো কখনো সমাজ একা তা পারে না বা পারতে দেয়া হয় না। এখানেই রাষ্ট্রের ভূমিকা। শিশুকে কথা বলা ও হাঁটা শেখানো যেমন সমাজের দায়িত্ব, প্রত্যেক শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখানো তেমনি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ব্যক্তিজীবনের উপর বিরাট ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন, অক্ষরজ্ঞানের অভাব বা নিরক্ষরতা মানুষকে দাস জীবনযাপনের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

আমরা জানি, সমাজে কিছু অমানুষ থাকে যারা অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামিয়ে দাস ব্যবসা করে থাকে। শোনা যায়, হারানো বা চুরি-করা শিশুদের অঙ্গহানি করেও তারা এরকম ব্যবসায় নামায়। সোজা কথায়, কোনো মানুষের একটি অঙ্গহানি হলে তার অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যার অক্ষরজ্ঞান নামের চোখ বা হাতিয়ারের অভাব তার জীবনেও অনুরূপ বিপদ ওত পেতে থাকে। তার মানে এ নয় যে, নিরক্ষর মানুষ মাত্রই অভিশপ্ত জীবন যাপন করেন। বরং অন্ধ মানুষ যেমন, নিরক্ষর মানুষও তেমনি জ্ঞানী, ধনবান বা ক্ষমতাবান হতে পারেন, নাও পারেন। কেননা অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা, সম্পদ, ক্ষমতা কোনটির সরাসরি সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাক্ষরতাসম্পন্ন মানুষের চেয়ে নিরক্ষর মানুষকে প্রতারণা, অপমান, অত্যাচার ইত্যাদি করা সহজ। মানুষ শিক্ষিত হলে, সে শিক্ষা যত ত্রুটিপূর্ণই হোক, তার মধ্যে যে আত্মসচেতনতা ও সম্মানবোধ জন্মায় তার ফলে তাকে দিয়ে দুরবস্থার মধ্যেও যেকোনোরকম দাসত্ব করানো কঠিন। সাক্ষরতা যেহেতু মানুষের আরেক জোড়া চোখ বা হাতিয়ার, অপরাধীর বেশকিছুটা ভয় না পাওয়ার কারণ নেই।

সাক্ষরতাহীনতা তাই সমাজ ও দেশের জন্য অভিশাপ। অথচ বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে না হলেও অন্তত প্রত্যেক উপযুক্ত বয়সী ছেলেমেয়েকে শুধু লিখতে পারাটুকু শেখানো গেল না কেন? কেন দেশে এমন একটি শিশুও থাকবে যে স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পেল না? কারণ সবসময় শিক্ষাকে শিশুর জন্য সুযোগ হিসেবে দেখা হয়েছে, তার অধিকার হিসেবে নয়। কোনো কোনো দরিদ্র পরিবারের শিশু স্কুলে যেতে পারে না, বা গেলেও কদিন পর ঝরে পড়ে। সে ক্ষেত্রে স্কুলকেই তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। কোন আধুনিক রাষ্ট্র কোনো শিশুকে এই একজোড়া চোখ বা এ হাতিয়ার ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না।

তবু সাক্ষরতা একটি অস্ত্র মাত্র। সনদপত্র সেই অস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপক স্বাধীনতা। তাই মানুষের ন্যূনতম সাক্ষরতা ও সম্ভব হলে সাক্ষরতা-নির্ভর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আরো উচ্চ দক্ষতার অস্ত্র যেমন দরকার, তা ব্যবহারের অনুমতি হিসেবে সনদপত্রও প্রয়োজন – যার জন্য চারদিকে মধ্য-নিম্নমধ্যবিত্তের এত ছোটাছুটি। এ ছোটাছুটির মধ্যে অস্ত্রের সুষ্ঠু ব্যবহার শেখা নয়, অস্ত্রের ব্যবহারের জন্য সনদ লাভের আকাঙ্খা প্রধান। গাড়ি চালানো শেখা নয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স চাই। আবার অস্ত্র ভাল ও মন্দ দুরকমেই ব্যবহার করা যায়। ছুরি ডাকাতের হাতে এক জিনিস, ডাক্তারের হাতে অন্য জিনিস। আর ডাক্তার যদি নীতিবিবর্জিত হন, তবে তা ডাকাতের হাতের চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

অসুস্থ সমাজে গাড়ি চালানো শেখার চেয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স বা অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার শেখার চেয়ে অস্ত্র চালানোর লাইসেন্স – অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের চেয়ে সনদপত্র বেশি প্রয়োজন। ধনী-মধ্যবিত্ত-গরিব সব শ্রেণির মানুষ যখন একেকটা সনদপত্রের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে, সেখানেও উচ্চ শ্রেণির মানুষের তৈরি একটা কারসাজি আছে। ধরুন, সবার হাতে একই শিক্ষা-পর্যায়ের সনদপত্র দেখা যাচ্ছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, রাষ্ট্র বা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের সমান বিবেচনা করবে। তা কখনো হয় না। এবার দেখা হয়, সনদপত্রটি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দেওয়া। এ কারণে বিভিন্ন

বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে না হলেও অন্তত প্রত্যেক উপযুক্ত বয়সী ছেলেমেয়েকে শুধু লিখতে পারাটুকু শেখানো গেল না কেন? কেন দেশে এমন একটি শিশুও থাকবে যে স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পেল না? কারণ সবসময় শিক্ষাকে শিশুর জন্য সুযোগ হিসেবে দেখা হয়েছে, তার অধিকার হিসেবে নয়।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নানা উপায়ে তার ইমেজ গড়ে তোলে। 'সেরা' স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাজেজা এই। চাকরির বাজারে আপনি কোন সামাজিক শ্রেণি থেকে উত্থিত তা নির্ধারণ করা হয়, আপনার সনদপত্রটি যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া তার নাম থেকে। যেহেতু ওই নামের মধ্যে আপনি কোন সমাজবর্গের সদস্য তার ইন্ডিকেটর লুকানো থাকে। এতে নিরপেক্ষতার ভাণ বজায় রেখেও অনায়াসে উচ্চবর্গের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়। নির্বাচনকারীর মনের অজান্তেই এ স্বার্থবোধ কাজ করে। তারপরও নিম্নশ্রেণি থেকে যে ব্যক্তি সকল বাধা অতিক্রম করে উপরের সিঁড়িতে উঠে যেতে পারে, তাকে একটা জ্বলজ্বলে উদাহরণ হিসেবে আকাশে তুলে ধরে এ ব্যবস্থার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়।

শিক্ষা, সাক্ষরতা, সনদপত্র লাভ এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করা ও তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের উৎসাহ এর কোনটিই গোষ্ঠীস্বার্থ-নিরপেক্ষ নয়। যেসব বিশৃঙ্খলা হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় ও যা নিয়ে মাঝেমাঝে হৈচৈ হয় তাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ব্যাপার নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাজাত ব্যবস্থার চিত্র। এর প্রতিটি অংশ প্রচলিত সমাজযন্ত্রের একেকটি স্ক্রু।

শিক্ষাকে অর্থবহ করতে হলে প্রকৃত শিক্ষা ও সাক্ষরতার মধ্যেকার গড়মিল পষ্ট হওয়া দরকার। নৈতিক-মানসিক -সাংস্কৃতিক বিকাশ দ্বারা সনদপত্রমুখী শিক্ষাকে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল সনদপত্র ও পরীক্ষায় ভাল ফলের পিছনে ছুটলে নিজের কিছু অন্যায় সাময়িক স্বার্থ হাসিল হতে পারে, কিন্তু সমগ্র জাতি ফাঁকির গভীর গহ্বরে পড়বে। আমরা সর্বজনীন সাক্ষরতা, পরীক্ষায় সত্যিকারের ভাল ফল, যথার্থ সনদপত্র ও প্রকৃত শিক্ষা চাই।

লেখাটি দৈনিক সংবাদ-এ (৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫) প্রথম প্রকাশিত। ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।

কার্টুন

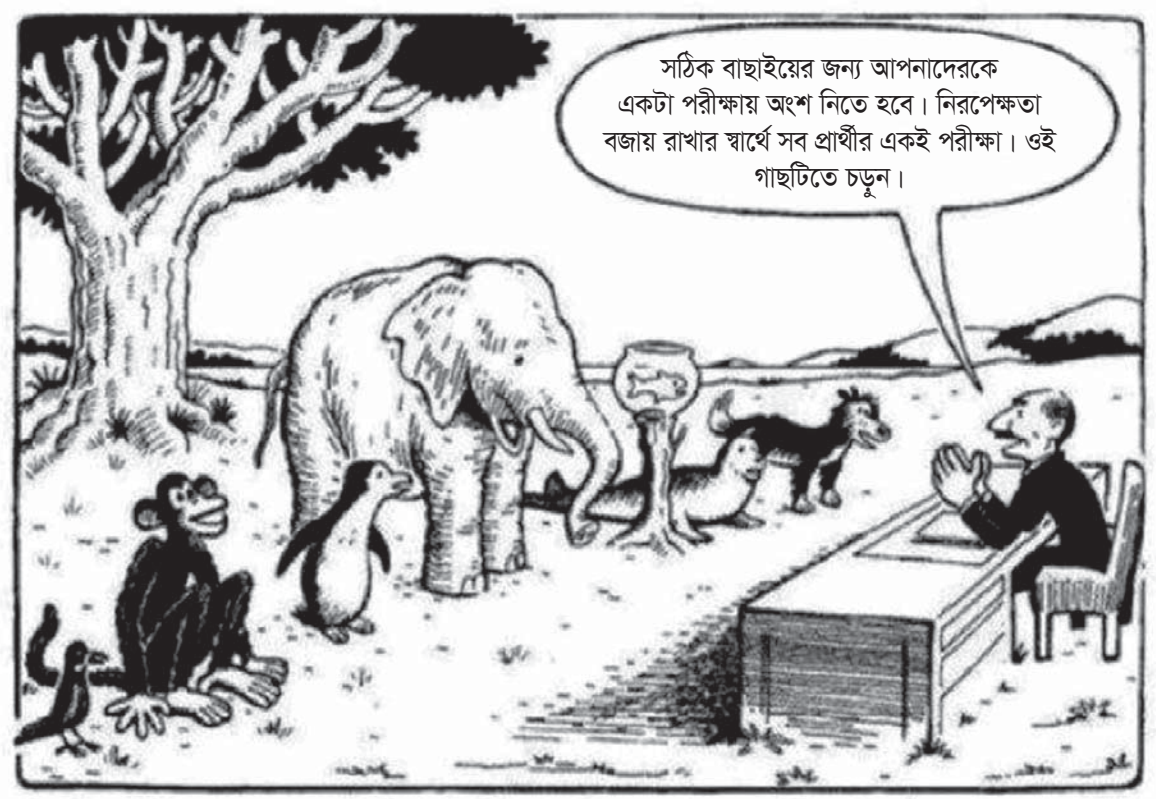

প্রত্যেকেই মেধাবী। কিন্তু গাছে চড়ার দক্ষতা দিয়ে যদি একটি মাছের মেধা পরীক্ষা করা হয়, তাহলে সে সবসময় একটা আস্ত মূর্খ প্রমাণিত হবে। - *আইনস্টাইনের নামে উক্তিটি প্রচারিত (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)*

জাপানের একটি গ্রামে একদিন

এ. কে. ফজলুল বারি

এ লেখাটি কুমিল্লা কোতওয়ালী থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির (কেটিসিসিএ লি.) মুখপত্র 'সমযাত্রা'য় (জুলাই ১৯৮৮) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ২৮ বছর আগের এ লেখার প্রেক্ষিত ভিন্ন। তখনকার বাংলাদেশের কৃষি এবং প্রযুক্তি যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থা থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। তবু তখনকার জাপানী কৃষিতে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছিল অনেক।

লেখকের সেদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা তাঁকে এখনকার বাংলাদেশের কৃষির প্রেক্ষিত বিবেচনা করে নতুন মত দিতে অনুরোধ করেছিলাম। মূল লেখার পরপর 'ফিরে দেখা' উপশিরোনামে লেখকের বর্তমান মত যুক্ত করে লেখাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।

আমি জাপানে এসেছি আজ পাঁচ দিন। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে টোকিও পৌঁছি। সেখানে একদিন অবস্থানের পর চলে আসি জাপানের উত্তরাঞ্চলে হোক্কাইডুতে। এখানকার অবিহিরো কৃষি ও পশুবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সপ্তাহের একটি সেমিনারে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধি।

সেমিনারের কর্মসূচি অনুযায়ী আজ আমাদের গ্রাম পরিদর্শন। ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঠিক ন'টার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে আমাদের বাস রওয়ানা হয়ে গেল। সময়ের এই নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে আমাদেরকে সেমিনারের প্রথম দিনেই সজাগ করে দিয়েছিলেন এই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞ আমেরিকান একজন শিক্ষক মি. মিলার (তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বছর যাবত ইংরেজী ভাষার শিক্ষক)। জাপানের অবস্থান এবং এখানকার রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি আমাদের অবহিত করছিলেন। কথা বলার কায়দা এবং পরিবেশনার বিষয় ছিল একেবারেই আমেরিকান। সেমিনারে দেরী করে আসা উচিত নয়–এই কথাটি সরাসরি না বলে বললেন, জাপানীজদের সম্পর্কে লোকে বলে যে তুমি যদি কখনও এক মিনিট দেরী করে ফেল, তাহলে বুঝবে যে তুমি এক মিনিটই ঠকে গেলে। খোদ মার্কিন শহরেই তাদের বলার এ বিষয় লক্ষ্য করেছি। সে দেশের দোকানে দেখেছি 'ধূমপান নিষেধ' - এই কথাটিই ঘুরিয়ে লিখবে 'এখানে ধূমপান না করার জন্য ধন্যবাদ'।

গ্রামের পথে বাসে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সাত দেশের সাতজন প্রতিনিধি ছাড়াও আমাদের সঙ্গে গেলেন দুজন অধ্যাপক, একজন মহিলা দোভাষী এবং মি. মিলার। বাসে উঠে বসে জায়গা নিতেই অধ্যাপক ইউশিমিচি সোমেয়া আমার হাতে একটি এনভেলাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইউনেস্কো এসোসিয়েশন থেকে তোমার জন্য কিছু উপহার। এনভেলাপ খোলার আগেই তিনি আরও কিছু কাগজ বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'এখানে জাপানের উপর অনেক বইয়ের নির্দেশিকা পাবে। তুমি যে ধরনের বই সম্পর্কে জানতে চেয়েছ সেগুলো আমি দাগিয়ে দিয়েছি। মনে পড়ল, গতকালই আমি অধ্যাপক সোমেয়ার কাছে জাপানের পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে জাপানের পল্লী সমাজের বিবর্তনের উপর কিছু বইয়ের রেফারেন্স জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, এত বিস্তারিত পেয়ে যাব ভাবিনি। এটাও জাপানীজদের একটা বৈশিষ্ট্য। এ কথাটাই অবিহিরো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ফিলিপাইনের ছাত্র জব আমাকে বলছিল। কথা প্রসঙ্গে জবকে বলছিলাম, এখানকার গ্রীন পার্কের সেই বেঞ্চটা যা লম্বায় ৪০০ মিটার এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড় বেঞ্চ সেটা তো দেখা হ'ল না। তখন জব বলছিল, এখানকার কোন শিক্ষককে কথা বলে দেখ পাগল হয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে। মুখ থেকে কেউ কিছু বের করলে সেটা করার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠে।

সেমিনারে দেরী করে আসা উচিত নয়–এই কথাটি সরাসরি না বলে বললেন, জাপানীজদের সম্পর্কে লোকে বলে যে তুমি যদি কখনও এক মিনিট দেরী করে ফেল, তাহলে বুঝবে যে তুমি এক মিনিটই ঠকে গেলে। খোদ মার্কিন শহরেই তাদের বলার এ বিষয় লক্ষ্য করেছি।

বাসে করে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা আইকোকো গ্রামে এসে পৌঁছালাম। এরই মধ্যে এনভেলাপের জিনিষগুলি বের করে দেখে নিলাম। পরশুদিন টোকাচি নদীর ধারে এবং টোকাচি গার্ডকা পার্কে তোলা আমাদের কিছু গ্রুপ ফটো।

আইকোকো গ্রামে নেমে পরিচিত হলাম এই গ্রামের কৃষক মি.

হসোনোর সঙ্গে। একে সেদিন দেখেছিলাম ইউনেস্কো এসোসিয়েশনের দেওয়া রাতের খাবারের পার্টিতে, পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল হাউসের লবীতে। মনে হল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ আছে যেমন থাকে একাডেমীর সঙ্গে ভাল মডেল ফারমারদের।

প্রথমেই আমাদের স্বাগত জানালেন মি. হসোনো। প্রত্যেকের হাতে এক টুকরা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন। তাতে একটি গ্রাফ আঁকা। হসোনো খামারের গত দশ বছরের প্রধান ফসল আলু, সীম এবং বীট চাষের আওতায় জমির পরিমাণ এবং আয়ের হিসাব। ব্যাস।

মুখে বললেন, '৫৪ বছর আগে এই খামারের প্রতিষ্ঠা। তখন জমি ছিল ২২ একর। পিতা ১৯৩৮ সালে ১২.৫ একর এবং ১৯৬৮ সালে আরো ১২.৫ একর জমি কেনেন। আমি ১৯৭৯ সালে সরকারের কাছ থেকে ২৭ একর জমি কিনি। [এই এলাকায় আগে বন্যার পানি উঠত। সরকার সম্প্রতি বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করেছে। বাঁধের পাশের জমি সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়ে এতদিন হসোনো সাহেব চাষ করতেন। '৭৯ সালে তা কিনে নিয়েছেন।] আমার বাড়ীতে বাবা-মা, স্ত্রী এবং তিন কন্যা নিয়ে আমরা থাকি।

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আমার একটা গাভীর খামার ছিল। সেখানে ১৭টা গাভী ছিল। এক একটা গাভী ২৫-৩০ সের দুধ দিত। কিন্তু গাভীর খামার পরিচালনা করতে দুটো জিনিস আবশ্যকীয় ছিল। অনেক পুঁজি এবং চারণ ভূমি। এই দু'টো জিনিসের অভাব হেতু অবশেষে গাভী পালন ছেড়ে দিয়েছি।

'চাষবাস করার জন্য সরকার বেশ কিছু ভর্তুকি দেয়। বিশেষ করে বড় আকারের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ। যেমন ট্রাক্টর, হারভেস্টার ও অন্যান্য মেশিন আমি ভর্তুকি পাওয়াতে কিনতে পেরেছি। তাছাড়া, এই এলাকার সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার ৮০০ মিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ২০ কোটি টাকা) মূল্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ দিয়েও আমরা খুব উপকৃত হচ্ছি।'

এরপর মি. হসোনো আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। বেঁটে এবং কিছুটা মোটা মহিলা। চোখেমুখে পরিশ্রমী শরীরের ছাপ। মহিলার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই প্রথমবারের মত আমার মনে হ'ল একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার হাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হসোনো খামারের সকল যন্ত্রপাতি চালানো, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এই মহিলার। আমাদেরকে নিয়ে গেলেন মেশিন ঘরে। আমাদের দেশের

মিসেস হসোনো আমাদেরকে প্রথমে গুদামের বাইরে রাখা ট্রাক্টরটি দেখালেন। পাশে দু'টি প্রাইভেট কার এমনভাবে পড়ে আছে যেন এগুলো কিছুই নয়। সম্ভবত গাড়ী দুটোর একটি স্বামী এবং অন্যটি স্ত্রী ব্যবহার করেন। গুদাম ঘরের চারিদিকে মেশিন। কেবলমাত্র বড় মেশিনগুলির সাথে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমটি আলু তোলার যন্ত্র। এ ধরনের যন্ত্র আছে দুটি

'আমার মোট জমির পরিমাণ তাই ৭৪ একর। এখানকার কৃষকদের তুলনায় আমার জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশী। ফসলের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। আমার উৎপাদিত দ্রব্য আমি সমবায় সমিতির চাইতে খোলা বাজারে বিক্রি করি। কারণ সমবায় যখন এগুলো কেনে তখন তারা দু'টো জিনিস দেখে। এক, উৎপাদিত দ্রব্যাদি ছোট ছোট বস্তা/বাক্সে প্যাকেট করে দিতে হয়। দুই, দ্রব্যাদির একটা নির্দিষ্ট গুণগত মান থাকতে হয়। খোলা বাজারে বিক্রি করতে এগুলোর কোন ঝামেলা নেই। আর তাছাড়া বড় প্যাকেট হলে আমার খরচ অনেক কমে আসে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সমবায় এবং খোলা বাজারে দাম প্রায় একই।

'আমাদের পুরো খামারটা আমি এবং আমার স্ত্রীই প্রধানত চালাই। তবে চারা রোপণের সময় এবং ফসল তোলার সময় তিন থেকে চার জন শ্রমিক অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে হয়। অবসর থাকলে আমার মেয়েরাও আমাকে সাহায্য করে। ওরা তিনজনই স্কুলে পড়ে।

রেলওয়ে স্টেশনের বড় গুদাম ঘরের আকৃতি ও চেহারার ঘর সবটা জুড়ে বিরাট সব যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে আছে। সবগুলি চিনতেও পারলাম না। এতসব যন্ত্রপাতি এমনভাবে আমাদের দেশে কোথাও থাকলে নির্ঘাত সরকারকে একজন প্রকৌশলী রাখতে হবে, সঙ্গে অন্যান্য। মিসেস হসোনো আমাদেরকে প্রথমে গুদামের বাইরে রাখা ট্রাক্টরটি দেখালেন। পাশে দু'টি প্রাইভেট কার এমনভাবে পড়ে আছে যেন এগুলো কিছুই নয়। সম্ভবত গাড়ী দুটোর একটি স্বামী এবং অন্যটি স্ত্রী ব্যবহার করেন। গুদাম ঘরের চারিদিকে মেশিন। কেবলমাত্র বড় মেশিনগুলির সাথে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমটি আলু তোলার যন্ত্র। এ ধরনের যন্ত্র আছে দুটি। আর একটি মাঠে নিয়ে রাখা হয়েছে। জাপানে এখন আলু তোলার সময়। মাঠের যন্ত্রটি পরে আমাদেরকে চালিয়ে দেখালেন। আমরা সবাই মেশিনের চারিদিকে ফাঁকে ফাঁকে উঠে দাঁড়ালাম। মেশিনের শ্লথ গতির সাথে আলু মাটি থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। আলু বাছাই

করার পদ্ধতিটিও মেশিনের সঙ্গে যুক্ত। বড় আকারের আলু বড় চেম্বারে এবং ছোট আকারের আলু ছোট চেম্বারে চলে আসছে।

এরপর দেখালেন দ্বিতীয় যন্ত্রটি। এটি দিয়ে জমি চাষ এবং জমিতে সার বিতরণের কাজ একসঙ্গে করা হয়। একটি কাটিং মেশিন দেখালেন যা দিয়ে ঘাস কাটা হয়। পরের মেশিনটি একটি রোপণ যন্ত্র। বেশ মজার মেশিন। এটি দিয়ে হসোনো পরিবার আগে ১০০ বর্গমিটার জমিতে ৮,২০০টি বীটের চারা রোপণ করতে পারতেন। কিন্তু দেখা গেল যে, মাঝে মাঝে কিছু চারা গজায় না। অর্থাৎ যে সমস্ত চারা ভাল নয়, সে সমস্ত চারাও মেশিনটি রোপণ করে ফেলে। তখন মেশিনটিতে একটি 'সেন্সর' সংযুক্ত করা হল। অর্থাৎ রোপণের সময় মেশিনটি নিজেই বাছাই করে নিতে পারবে যে কোন চারাগুলো গজাবে না। সেগুলো রোপণ থেকে বাদ যাবে। ধীরে ধীরে মেশিনকেও মানুষ বানিয়ে ফেলছে ওরা। একটি ঔষধ ছিটানোর মেশিনও দেখাল। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এত বড় মেশিন দিয়ে ঔষধ ছিটাতে পারে। হারভেস্টারের মত বিরাট সব যন্ত্রপাতি।

হসোনো সাহেব এরপর আমাদেরকে মাঠ দেখাতে নিয়ে গেলেন। যে সমস্ত জমি থেকে ফসল উঠে গেছে সে সমস্ত জমি চাষ দিয়ে তৈরি করে রাখা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই বীটের বীজ বুনা হবে। আগামী মাস থেকে এই এলাকায় প্রচুর বরফ পড়া শুরু হবে। বীটের চারা তখন মুখ গুজে বরফের নিচে পড়ে থাকবে। মাস তিনেক পরে যখন বরফ চলে যাবে তখন এগুলো মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাই, বছরে মাত্র একটি ফসলই এই এলাকায় জন্মে। মাঠের এক কোণে বিরাট আকারের কম্পোস্ট সারের স্তূপ দেখালেন। জমি চাষের সময় এগুলো মিশিয়ে দেওয়া হয়। হসোনো পরিবারের খামারের জন্য বছরে প্রায় ২৫০ টন কম্পোস্ট সারের প্রয়োজন পড়ে। যেহেতু তাদের কোন গরু নেই, অতএব তারা এটা বাইরে থেকে কিনে।

হসোনো সাহেব একজন আদর্শ কৃষক। কৃষিকাজ কোথা থেকে শিখেছেন অর্থাৎ পড়াশুনা কতটুকু করেছেন জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে গেছেন। বললেন, অভিজ্ঞতাই বড় শিক্ষা। কাজ করতে করতে শিখেছি। গত ১৫ বছর যাবত তিনি তার খামারের হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য তথ্যাদি খুব সুন্দরভাবে রাখছেন। এ এলাকায় এ ধরনের মনোযোগী কৃষক আরও ৫ জন আছেন বলে তিনি জানালেন। উৎপাদনের হারের গতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, যেহেতু কৃষি কাজ তিনি আগ্রহ নিয়ে করেন সেহেতু তাঁর খামারে উৎপাদনের হার বাড়ছে।

হসোনো পরিবারে কোন ছেলে নেই। মেয়ে তিনটি। প্রসঙ্গত আমরা জানতে চাইলাম, তাঁর অবর্তমানে এ খামারের অবস্থা কি হবে। একটু ইতস্তত করে বললেন, বলা মুস্কিল। তাদের বড় মেয়ে এবার হাইস্কুল পাশ করবে। ইচ্ছা আছে অবিহিরো বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে পড়ানোর। তাছাড়া মেয়েকে যদি কোন কৃষকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো তারাই এটা দেখাশুনা করবে। তবে অনিশ্চয়তার সাথেই উল্লেখ করলেন দুজনে। অবশ্য মেয়েরা কি ভাবছে তা আমরা জানিনে।

খামার পরিদর্শনের পর তাদের বাড়ির সম্মুখের লনে আমাদেরকে তারা আপ্যায়িত করলেন। অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিষ্কার দূর্বা ঘাসের লন। চারিদিকে নানা রঙের সারি করে লাগানো ছোট ছোট ফুল গাছ। প্রধান সড়কের পাশেই বাড়ি। যে রাস্তাটা বাড়ির পথে নেমে এসেছে তার দু'ধারে সারি করে দু'লাইনে ফুলের গাছ। তার দু'পাশের দু'লাইনে মূলা গাছ। আপ্যায়ণে আমাদেরকে দিলেন সিদ্ধ ভুট্টা আর ঘরে তৈরি চাউলের কেক। হসোনো পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে বাসে চলতে চলতে আমার মনে হ'ল এই নির্জন, নিরিবিলি জায়গায় এত সুন্দর সাজানো বাড়ী, ফুলের গাছ, পরিচ্ছন্নতা এ কার জন্য। দেখার লোক কই? নিজের জন্য মানুষ কতটা পরিপাটি হয়ে থাকে জাপানী কৃষক পরিবার তার নিদর্শন।

ফিরে দেখা

এই সেদিনও বাংলাদেশের কৃষি ছিল মান্ধাতার আমলের। মৌসুমের সময় কৃষক বীজ ছিটিয়ে আসত মাঠে, আর সময়মত কেউ নিয়ে আসত। ফলন নির্ভর করত প্রকৃতির উপর। প্রকৃতি সহায় হলে কিছু ফলন পেত, না হলে সবটাই মারা যেত। কৃষকের করার কিছু ছিল না। এই কৃষিকে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয় ষাটের দশকের দিকে। তখন জাপান ছিল কৃষিতে অত্যন্ত অগ্রসর দেশ। জাপান থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞ এনে 'জাপানী পদ্ধতিতে চাষবাস' প্রবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে দেশের কোথাও কোথাও ডেমোনেস্ট্রেশন প্লটের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতেন। খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি তখন।

আমাদের দেশে কৃষিতে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। উন্নত প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি আধুনিকীকরণের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা নেয় তখনকার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা কোতয়ালী থানায়। এখানেও মূল ভূমিকা পালন করে জাপানী কৃষি বিশেষজ্ঞ দল। উন্নত প্রযুক্তি বলতে তখন জাপানী বিশেষজ্ঞরা উন্নত বীজ, লাইন করে রোপণ, রাসায়নিক সার ব্যবহার, আগাছা দমন, সঠিক সময়ে কাটা, মাড়াই এবং ফসল তোলা ইত্যাদি এবং যান্ত্রিকীকরণ বলতে তখন গরুর পরিবর্তে পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষ, শুষ্ক মৌসুমে সেচযন্ত্র ব্যবহার করে সেচের ব্যবস্থা, লাইনে সঠিকভাবে রোপণের জন্য দড়ি ব্যবহার, আগাছা দমনের জন্য উইডার-এর প্রচলন, গরু দিয়ে মাড়াইয়ের পরিবর্তে পা-চালিত মাড়াই যন্ত্র-এর ব্যবহার ইত্যাদি বোঝাতেন। জাপানী বিশেষজ্ঞরা এগুলো গুরুত্ব দিয়ে প্রচলনের চেষ্টা করেন। কুমিল্লা কোতয়ালী থানা এবং সমগ্র বাংলাদেশ যেহেতু ধান-প্রধান এলাকা সেহেতু দেশীয় উন্নত জাতের ধান দিয়ে এই আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু দেশীয় জাতের ধানের উৎপাদন ক্ষমতা যেহেতু সীমাবদ্ধ ছিল তাই জাপানী বিশেষজ্ঞরা বাইরে থেকে 'পাজাম' এবং 'তাইপে' নামক উন্নত

জাতের বীজ এনে তা প্রচলন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোতয়ালী থানায় কৃষিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যখন ইরি ধানের চাষ প্রবর্তন করা হয়। কোতয়ালী থানায় তখন নতুন এক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার (গ্রামভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে মডেল ফারমার প্রশিক্ষণের কারণে) মাধ্যমে এই কাজের দ্রুত প্রসার ঘটে। ধানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের উন্নত জাতের সবজি চাষেরও প্রচলন করেন জাপানী বিশেষজ্ঞরা। তার মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, শালগম, বীট, গাজর, ব্রোকলী, মূলা, তরমুজ, মিষ্টি আলু, মিষ্টি ভুট্টা ইত্যাদি প্রধান ছিল। সেই সময় একাডেমী সারাদেশ থেকে গ্রুপ করে করে বাছাই করা কৃষকদের এনে প্রশিক্ষণ দেয় এবং গ্রামে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে কলমে দেখায়। এ সময়টায় সত্তরের দশকে একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আখতার হামিদ খান দাবি করতেন যে, কুমিল্লা কোতয়ালী থানায় একজন কৃষক একরপ্রতি যে পরিমাণ ধান ফলায় তা জাপানের একজন কৃষকের পরিমাণের প্রায় কাছাকাছি।

এ সময়টায় আমি এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমি তখনকার জাপানী বিশেষজ্ঞদের কাউন্টারপার্ট হিসাবে কাজ করতাম। তারা গ্রামে মাঠে-ময়দানে যে সকল কাজ করতেন তা আমরা দেখতাম। কিন্তু একটা সমস্যা ছিল, তাদের কাছ থেকে আমরা লিখিত কোন রিপোর্ট পেতাম না। কারণ তারা রিপোর্ট লিখতেন জাপানী ভাষায়। আমি তখন প্রস্তাব করলাম, 'তোমাদের রিপোর্টটির অনুবাদ যদি আমাকে বলো, তাহলে আমি তা ইংরেজিতে লিখে দেব এবং একাডেমী তা প্রকাশ করবে।' তারা খুশি হয়ে রাজি হলেন। তাই করলাম। কিছুটা উচ্ছ্বসিত ছিলাম, এজন্য যে বাংলাদেশের কৃষি এগোচ্ছে। তাই এক পর্যায়ে কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'আচ্ছা এই রিপোর্টের মধ্যে জাপানী কৃষির অর্থাৎ জাপানী গ্রামের বা জাপানী কৃষকের সঙ্গে আমাদের কৃষির একটি তুলনামূলক চিত্র দিলে কেমন হয়?' আমার জাপানী দলপতি মি. কাজুতু মিছাওয়া বাংলা বলতে পারতেন না। তিনি অনেকদিন ভারতে কাজ করে হিন্দি শিখেছিলেন। সেই ভাষায় এখানকার কৃষকদের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন বলে আর বাংলা শিখার প্রয়োজন হয়নি। যাই হোক, আমার প্রস্তাব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে বললেন, "ইয়ে তো হোতা নেহি।" আমি তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ১৯৮৭ সালে জাপানে গিয়ে যখন দেখলাম তখনকার প্রচলিত উইডার, পদচালিত মাড়াই যন্ত্র (যা আমরা এখনও ব্যবহার করছি) ইত্যাদি জাপানের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে এবং হসোনো পরিবারের চাষ পদ্ধতি দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম মিছাওয়া সাহেবের মন্তব্যের মর্মার্থ। কৃষি অগ্রগতিতে তখন উচ্ছ্বসিত হলেও এখন বুঝতে পারি আর কতদূর যেতে বাকি আছে আমাদের।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমার বক্তব্যটি শেষ করব। ধান-সবজি উৎপাদনে আমরা এগিয়ে গেলেও দুধ উৎপাদনের অবস্থাটা একবার বিবেচনা করুন। হসোনো পরিবার জানিয়েছেন, তখন জাপানে একটি গাভী গড়ে প্রতিদিন দুধ দেয় ২৫-৩০ সের। আর আমাদের দেশে এখনও দুধের উৎপাদন গাভীপ্রতি দৈনিক ২-২.৫ সের। জাপানে এই উৎপাদনের পরিমাণ আর যেন না বাড়ে বরং কমে তা নিয়ে তখন গবেষণা হচ্ছে সেদেশে। এ রকম একটি কেন্দ্রে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গো-খাদ্য কমিয়ে গাভীর স্বাস্থ্য ঠিক রেখে দুধ উৎপাদন সীমিত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছিল গবেষণা কেন্দ্রটি। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম দুধ উৎপাদন কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? তারা বললেন, দুধ উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। বললাম, তাতে ক্ষতি কি? দুধকে গুঁড়ো দুধে রূপান্তর করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। তাদের উত্তর শুনে আবার থ হয়ে গেলাম আমরা। বলল, আমরা হিসেব করে দেখেছি তাতে আমাদের যা খরচ তার চাইতে গুঁড়ো দুধ বিদেশ থেকে কিনে আনলে আমাদের খরচ কম। তাই এ প্রচেষ্টা।

শেষ কথা, আমাদের কৃষি গত কয়েক দশকে অনেক এগিয়ে গেলেও জাপানের তুলনায় এখনও কত পিছিয়ে আছি তা এই আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যায়। অতএব আমাদের যেতে হবে আরও বহুদূর।

লেখক বার্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-কুমিল্লা)-এর প্রাক্তন পরিচালক।

শিক্ষালোক

পুরনো স্কুল/কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক/শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধার্ঘ্য, স্থানীয় পর্যায়ে যেকোন ব্যতিক্রমী শিক্ষা-উদ্যোগ, সৃষ্টিশীল পাঠদান কৌশল সহ শিক্ষা বিষয়ে আপনার মূল্যবান ভাবনা-চিন্তা লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন।

শিশুদের ভালভাবে পড়ানোর কৌশল আমার অভিজ্ঞতা

রেহেনা আক্তার

শিশুদের মন মোমের মতো। মোমকে জ্বালিয়ে যেমন একটি ঘরকে আলোকিত করা সম্ভব তেমনি শিশুদের মনেও শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করা সম্ভব। কথায় আছে – আজকের শিশুই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুর মনেই প্রথম শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আজকের শিশুই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিনিধি। আজকের ছোট্ট শিশুটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে আগামী দিনের নাগরিক হিসেবে পৃথিবীতে স্থান করে নিবে। প্রত্যেক শিশুর অন্তরেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে। তার মধ্যেই সুপ্ত হয়ে থাকে অনাগত শিশুর পিতা। শিশুকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ। আর এগুলো দিতে পারেন একজন আদর্শ শিক্ষক বা শিক্ষিকা। এজন্য নিচের কলা-কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ক্লাসের পরিবেশ: প্রথমে ক্লাসে ঢুকে ছাত্রছাত্রীর সাথে কুশলবিনিময় করতে হবে। তারা কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে হবে। তাদেরকে শ্রেণীভিত্তিক বসিয়ে দিতে হবে। পরে তাদের শ্রেণীভিত্তিক পড়া ও লেখা শেখাতে হবে।

বর্ণ শেখানোর উপায়: শিক্ষিকা যে বর্ণটি শিখাবেন তা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবেন। পরে শিশুদের তা পড়তে বলবেন। যেমন 'অ' বর্ণটি শেখানোর সময় শিক্ষিকা প্রথমে কয়েকবার সে বর্ণটি নিজে পড়াবেন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের পড়তে বলবেন। আবার খেলার ছলেও তাদের বর্ণ শেখানো সম্ভব। যেমন ক্লাসে একজনের নাম দিলেন 'অ'। অন্যজনকে জিজ্ঞেস করবেন, বলো তো ওর নাম কি? সে সহজেই বলতে পারবে। কারণ ওরা সঙ্গীদের নাম তাড়াতাড়ি মনে রাখতে পারে। পর্যায়ক্রমে সবার নাম স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে রাখা যেতে পারে। এভাবে ওরা খেলার ছলে বর্ণগুলো তাড়াতাড়ি মনে রাখতে পারবে।

লেখা শিখানোর উপায়: বর্ণগুলো পড়ার সাথে সাথে বোর্ডে যার যার নাম – মানে বর্ণমালা লিখবে। এভাবে তাড়াতাড়ি বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ পড়া ও লেখা শিখানো সম্ভব।

গণিত শেখানো: আমার ক্লাসে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী আছে। সবাইকে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে একজন থেকে শুরু করে ২৫ জন পর্যন্ত গুণে ফেললাম। পরে ওদের দিয়েই গণনা শেখানো সম্ভব। প্রথমে যে বসেছে তার নাম্বার ১, পরে ২, ৩, ৪, ৫ এভাবে ২৫ পর্যন্ত গণনা করা যেতে পারে। পরে একজনকে নির্দেশ করে বলতে হবে তোমার নাম্বার কি? সে সহজেই বলতে পারবে ওর নাম্বার '১'। এবার ১ সংখ্যাটি বোর্ডে লিখে দেখাতে হবে। পরে ছাত্রছাত্রী বোর্ডে এসে তার উপর হাত ঘুরাবে এবং তা বোর্ডে লিখবে, এরপর যারযার খাতায় লিখবে। এভাবে সংখ্যা পড়া ও লেখার ধারণা দেয়া যেতে পারে।

যোগের ধারণা: ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এ কাজটা করা যেতে পারে। দুজন ছাত্রকে কাছে এনে একজনকে এক পাশে ও আরেকজনকে অন্য পাশে এনে বলতে হবে: ১ জন + ১ জন, কত? তখন ওরা সহজেই বলতে পারবে, ২ জন।

বিয়োগের ধারণা: দুজন ছাত্রকে একত্রে এনে একজনকে সরিয়ে ফেলে বলতে হবে, এখন কয়জন ছাত্র? ওরা সহজেই বলতে পারবে, ১ জন। এভাবে ওরা জানবে ২–১ = ১।

একইভাবে গুণ ও ভাগ শেখানো যাবে।

ছড়া শিখানো: শিক্ষিকা প্রথমে ছড়া/কবিতাটি পুরোটাই পাঠ করে শুনাবেন। তারপর ১–২ লাইন ভালভাবে পড়ে শুনাবেন এবং ছাত্রছাত্রীরা সাথে সাথে পড়বে। পড়াটা যাতে তারা আগামী দিন দিতে পারে সেজন্য তাদেরকে ছোট দলে বসিয়ে পড়া মুখস্থ করাতে হবে। পরে বড় দলে যাচাই করতে হবে।

এর সাথে কবিতার অংশ থেকে কঠিন বানান, অর্থ, ছোট প্রশ্নের উত্তর এবং সারমর্ম শিখাতে হবে। আবার যুক্তবর্ণগুলোও বোর্ডে ভেঙে ভেঙে লিখে দেখাতে হবে। যেমন– কষ্ট = ক+ষ+ট। একই নিয়মে গল্প পড়াতে হবে।

পড়তে ও লিখতে লিখতে ওদের মনে একসময় একঘেঁয়েমি এসে যায়। এজন্য মাঝেমাঝে গল্প, নাচ, গান, ছড়া-কবিতা বলা ও ছবি আঁকানো যেতে পারে। এতে করে তাদের মন পড়ালেখার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর এভাবে তাদের কাছ থেকে ভাল ফলাফল আশা করা সম্ভব।

লেখক আশুলিয়ার বোর্ডবাজার শাখায় একটি সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা। তিনি রচনা-প্রতিযোগিতা ২০১৩-এ বিজয়ীদের একজন।

১০ম CITI ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার

সিদীপ ২০১৪ সালের 'শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা' হিসাবে ১০ম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এই পুরস্কার সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। এ বছর ২ আগস্ট বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সংস্থার পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান-এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কার হিসাবে সিদীপ ৪ লক্ষ টাকা, একটি ক্রেস্ট এবং একটি সনদ প্রাপ্ত হয়।

চক্ষু চিকিৎসা শিবির

১২ জুন ২০১৫ পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় সিদীপ চারগাছ শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি - কুমিল্লা-এর পরিচালনায় একটি চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ মেডিকেল অফিসার ও প্যারামেডিক দ্বারা দিনব্যাপী ১৫৪ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৬ জন ছানি অপারেশনযোগ্য রোগী পাওয়া যায়, কুমিল্লায় বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি থেকে যাদের ছানি অপারেশন করানো হয়।

সৌর শক্তি প্রকল্প শুরু

সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সেবা ছাড়াও দরিদ্র জনগণের কাছে ন্যূনতম খরচে আলো (বিদ্যুৎ) পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন যাতে তারা রাতের বেলায় কাজ করতে পারে, ছেলেমেয়েরা রাতের বেলায় লেখাপড়া করতে পারে, গ্রামীণ পরিবেশেও রাতের বেলায় প্রয়োজনীয় চিত্তবিনোদনের সুযোগ পায়। এরূপ চিন্তা-চেতনায় ১৬ জুন ২০১৫ সালে সিদীপ ও IDCOL (Infrastructure Development Company Limited)-এর মধ্যে পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ যেন বাস্তবায়িত হয় এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হচ্ছে।

শিক্ষিকা সুমী খাস্তগির

মনজুর শামস

গ্রামে বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত ঘরের যেসব শিশুর বাড়িতে পড়া দেখিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই, ফলে ক্লাসের পড়া তৈরি করার ক্ষেত্রে ভীষণ অসহায় বোধ করে ও পড়াশোনায় আগ্রহ হারাতে থাকে এবং হয়তো এক সময় শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ছিটকে পড়ে, তাদেরকে আগের দিন ক্লাসের পড়াটা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য সিদীপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র চালায়। প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুরা এতে পড়ালেখা করে। গ্রামেরই কোনো মেয়ে সেবার মনোভাব নিয়ে তাদেরকে পড়ায়। চট্টগ্রামে কুমিরার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এরূপ একটি স্কুলে পড়ান গৃহবধূ সুমী খাস্তগির। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করে আত্মকর্মসংস্থানের একটা পথ করে নেয়ারও চেষ্টা করছেন। তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলে বিশ্বজিৎ খাস্তগির ক্লাস থ্রিতে এবং মেয়ে তন্বীরানী খাস্তগির এবার শিশুশ্রেণিতে পড়ছে।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সামনেই একটি করে ধান বা অন্য কোনো শস্য শুকানোর বিশাল নিকনো উঠোন। বাড়িগুলো পাশাপাশি হওয়ায় উঠোনগুলোও পাশাপাশি, ফলে এক বিশাল ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়েছে গোটা গ্রামের বহিরাঙ্গনে। তাই মেঠোপথ ধরে বেশ উঁচুতে গ্রামটির চৌহদ্দিতে ঢুকেই দেখতে পেলাম বাইশ-তেইশজন শিশু গোল হয়ে বসে পড়াশোনায় ব্যস্ত। কাছে যেতেই দেখলাম সুমী গভীর মমতায় শিশুদের পড়া দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন।

সুমী জানালেন, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি এই স্কুল চালাচ্ছেন। প্রথম বছর তার মোট ২০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। এদের ভেতরে ৯ জন ছিল শিশু শ্রেণির, ৫ জন প্রথম শ্রেণির এবং ৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণির। ৬/৭ জন ছিল একেবারেই বিত্তহীন পরিবারের, যাদের বাবা-মা ছিল নিরক্ষর। এ বছর তার স্কুলে ছাত্রছাত্রী ২৫ জন। এদের ১৩ জন শিশুশ্রেণির, ৫ জন প্রথম শ্রেণির এবং ৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণির। এদের মধ্যে ১০ জনই হতদরিদ্র পরিবারের।

নিজ জীবন সম্পর্কে বললেন, এসএসসি পাস করার পর ২০০৪ সালে হারাধন খাস্তগিরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চার-পাঁচ বছর আগে তার স্বামী ভারতের একটি ছোটখাটো হোটেলে চাকরি পায়। স্বামী বিদেশে যাওয়ার পর তিনি বাবার বাড়ি চলে আসেন। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগত তখন তার সবকিছু। বিয়ের আগেই সেলাইয়ের কাজ শিখেছিলেন, অগত্যা সে কাজেই মন দিলেন। এতে সময় কাটানোর একটা পথ করার পাশাপাশি নিজস্ব আয়েরও একটি উপায় খুঁজে পান তিনি। কিন্তু বিকেলবেলাটা সময় কাটানো বেশ দায় হয়ে পড়ল। কিছুটা অন্তর্মুখী সুমী একাকিত্বে ভুগতে থাকেন। এ সময় সিদীপের এক ফিল্ড অফিসার তাকে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি সম্পর্কে জানানোর পর তিনি নিজ গরজেই বাবার বাড়িতে এ স্কুল খোলেন। তার তত্ত্বাবধানে ক্লাসের পড়া তৈরি করে শিশুরা স্কুলে ভালো ফল করতে থাকায় তার আগ্রহটা আরো বেড়ে যায়।

বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সুমী তার স্কুলে শিশুদের পড়ান। তিনি মনে করেন দিনের এই সময়টা সংসারজীবনের অলস সময়, তাই এই সময়টুকু শিক্ষাদানের মতো মহৎ কাজে ব্যয় করতে পারাটা এক দারুণ ব্যাপার। এই সময়টা অসহায় শিশুদের পাঠে সহায়তা করে তিনি যেমন সময়ের সদ্ব্যবহার করছেন, তেমনি সময় কাটছে একটি ভালো কাজে, আর সামান্য হলেও হাতে দুটো পয়সাও আসছে। অকপটে জানালেন, সিদীপ সাহায্য না করলেও তার এ স্কুল চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

রক্তাক্ত হরিণ

মুরতজা আলী

হাওয়ায় নিমগাছটা বার কয়েক মাথা ঝাঁকায়।

একজোড়া দাঁড়কাক খসখসে গলায় বিরক্তি ছড়াল। চোখ-পোড়ানো আলোয় এখন ঝলসানো লোকালয়। খাদেমালী চিরকালের আসনে বসে ঘোলা চোখে তাকায়। ঊরুর পাঁচড়া চুলকালে নির্বিকারে খামচায় খানিক। মনে দগদগে ঘা। পাঁচড়া ফেটে রক্ত গড়ালে থামে খাদেমালী। বাইরে টগবগে আগুনের হল্কা। এক ঝলক হাওয়া তাকে ছুঁয়ে যায়। আর ময়লা উদোম গায়ে সে দেখে – আকাশ জ্বলছে, মাটি পুড়ছে, বাতাস তড়পাচ্ছে এবং তার পেটের আগুনও বসে নেই।

সে সময় তার দৃষ্টি ফেরে মাঠের দিকে।

ধানী মাঠ সবুজে ডুবে আছে। সবুজের ঢলেও তার খেতটা চোখে পড়ে আবছা। আউশ ধানের পেট চালে ভরা, শুধু পাকতেই যা কদিন –। খাদেমালী হিসাব কষে, হয় দশদিন, না হয় বারোদিন। খরায় আরও কম লাগবে – অভিজ্ঞতা থেকে সে ধার নেয়। পোড়া ঝামার মতো আকাশে একফালি মেঘ নেই। গোয়ালের গরুজোড়া চিৎকার জুড়ে দিলে সে উঠে দাঁড়ায়। 'সপ এইবার মোরবিগো, গরমেই সপ মোরবি।' তবে কিছুই মরছে না দেখে খাদেমালী হতাশ হয়। লক্ষ্মী পেঁচার মতো আলো আর আশা থেকে পালানো তার হয় না।

মাঠ থেকে চোখ ফেরে না।

হা-হা করা হাওয়া গায়ে চাবুক মারলেও খাদেমালী তাতে কী যেন খোঁজে। মাঠের সবুজ সমুদ্রের ঢেউ হয়ে নাচে একটানা। সে কেবল এক মনে হিসাব মিলায়। কদিন পর জোড়াতালির এ সংসারে ধান আসবে এবং পাকা ধান বলে সুগন্ধও আসবে – এমনি জাতীয় সংসারী মানুষের হিসাব।

বিড়ি জ্বালিয়ে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে খানিক কাশে।

ও সব্বোনাশে বউ, তোরা কি আমাক্ মাইরা ফ্যালাবার চাসরে? কচুগেচু খাওয়াইয়া মাইরা ফ্যালাবার চাস্ – অন্ধ মা বারান্দায় তার-স্বরে চ্যাঁচায়। বউ থামাতে গেলে 'আমাক্ গলা টিবে মার' বলে সে সমানে মাথা কোটে। পাটের মতো সাদা চুল, থলথলে শরীর আর অন্ধকার পৃথিবীকে সম্বল করে চেঁচিয়েই চলে।

খাদেমালী মুখ খোলে না।

দশ বছরের মোমেনা কচুঘণ্ট খেতে আপত্তি জানালে বউ দড়াম করে কিল বসিয়ে দেয়, 'তোর বা'জানরে চাল আনতে কইবার পারিস না?'

তাতানো গরমেও ঝিমুনি ধরে খাদেমালীর। সংসারটা ফাঁকা একদম। কি ফাঁকা। অবশ্য কটা দিন পেরুলেই ধান কাটবে সে – এ কথা কেউ স্মরণে আনছে না দেখে তার অস্বস্তি বাড়ে।

বউ এগিয়ে আসে, 'তোমার কি খাওয়াদাওয়া লাগবি না নাকি?'

খাদেমালী চুপিসারে এসে সানকি টেনে নেয়। মায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে একটু গলা খাঁকারি দেয়, 'এই তো আর কয়ডা দিন, দানডা কাটলিই হব কষ্ট গ্যালো।'

পোড়া বউটা ভরসা পায় না, পানি যে রহম বাড়তাছে, এবার আবার –।

'আল্লা আল্লা কর, আল্লাই বাঁচাবি। জান যহন দিছে, খোরাকও হেই দিবি।'

বউয়ের চোখেমুখে তবু অবিশ্বাস লেপ্টে থাকে।

পেটের খালিভাগ পানিতে ভরে খাদেমালী উঠোনে নামে। আকাশ গনগনে। মনে স্বস্তি এসে নাড়া দেয়। বৃষ্টি না হলে বর্ষা রাতারাতি ফেঁপে উঠবে না। একটা ফিঙে কাক তাড়িয়ে তার চোখ ঘুরায় মাঠের দিকে। দূরের বাঁধ নিশ্চল। তার চোখমুখ বালির মতো চিক্‌চিক্ করে। এবার বান আসা সহজ লয়রে – বাঁধের ভরসা তাকে বিড়বিড় করতে সাহস যোগায়। মস্তবড় বাঁধটা অনড় দাঁড়িয়ে নির্বিকার।

পড়ন্ত রোদে মাঠের দিকে পা বাড়ায় খাদেমালী।

আধপাকা খেতটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় সে। ধানগাছরা মাতোয়ারা। আল বেয়ে সে খেতের চারদিকে হাঁটে। সংসার তার ভিতরের চোখে ক্রমাগত জ্বালা ধরায়। সহসা বড় মেয়েটার মুখ মনে আসে – বিষ খেয়ে মরতে গিয়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে উঠেছে সে। বাঁচাডা কঠিন ঠিকই, মরাডা শালা আরও কঠিন – তার মনে হয়। কদিন আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছিল মেয়েটা, 'দান কাটলি কয় স্যার দান দিও বাজান, তাও একদিন প্যাট বোরে খাতি পারব। ওরা খাবার দেয় না, বুজলা, খালি পিটায়।'

খাদেমালী চোখে ঝাপসা দেখে।

'ও আল্লা, এবারের দানডা নিও না আল্লা!' একজোড়া মেঠো ইঁদুর ওপাশ দিয়ে ছুটে পালাল। অদূরের ধানখেতে ডাহুকের ডাক। খাদেমালী ধানের মিষ্টি ঘ্রাণ বুকে নিয়ে এগোয়। হাঁটতে হাঁটতে কখন বাঁধের উপর এসে ওঠে। বাঁধ ছুঁয়ে পানি থই থই করছে বিলে। বিল নিঃসাড়। হিসেবী গেরস্তের মতো সে অঙ্কে মনোযোগ দেয়। ওপাশে বানের জল আর উপরে জলভরা আকাশ – সবুজ মাঠ – এসবে মিল খুঁজে পায় না। তবে আকাশ জলভার সইলে বাঁধটা বানের জল ঠেকাবে এবার, সে জানে। শেষের আশ্বাসটুকু তার গলায় গান এনে দেয়, বহুকালের পুরানো গান, মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে ...।

খাদেমালী বাড়ির পথ ধরে।

বেলা ডুবে যায়। পাখিরা নিশ্চিন্তে ঘরমুখো। এই গোধূলিতে হঠাৎ ঘরে ফিরতে ভালো লাগে না, সে গাপাড়ার দিকে পা বাড়ায়।

সন্ধ্যার আঁধারে শুকলালের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়, 'শুকলালদা আছ নাকি?'

ষাটের শুকলাল দত্ত বাতি উঁচিয়ে ধরে, 'খাদেম নাকিরে, আয় আয়। আজকাল যে আসিস না একেবারে?'

বাঁশের বেঞ্চিতে বসতে বসতে সে কথা শুরু করে, 'সংসারে যা ঠ্যাহাঠেহি শুকলালদা, বাল লাগে না। মন বাল না থালহি গপ্পো কী করব কও?'

'এডা খাঁটি কতারে, মনই অইল সব। হেই মনই যদি বিগড়া যায়,' শুকলাল বলে চলে, কী আর থাহে ক?'

খাদেমালী কিছু বললে শুকলালের কথায় ঢাকা পড়ে যায়; 'যহন চাহরি করতাম, তহন ফুর্তিও আছিল, মনও আছিল বাল। বউয়ের যুক্তিত হেই চারহি ছাড়লাম, সুকও গ্যাল –।'

বেড়ার ওপাশে কে থপথপ করে এগিয়ে এসে চড়া গলায় 'কী কইলা' বলাতে শুকলাল কাঁচুমাচু হয়ে খকখক করে হাসে, 'হেই চারহিতে থাকতিইতো হরিণির মাংস খাইছিলাম। হরিণ মারা যা কষ্টরে, হে আর কী কবো – তুই তো জানিস না।'

খাদেমালী হা করে শোনে। শুকলাল আবার বকতে গেলে মুচিদের হারু এসে ঢোকে; 'হারুও আইছিস, হোন্ হোন্ – হরিণির মাংস তো খাস নাই তোরা, হরিণ মারা যে কী ঠ্যালা তাই কইতাছি –।'

হেতো কোন্ কালের গপ্পো শুকলালদা – চাঁচাছোলা কথা বলাই হারুর অভ্যাস। শুকলাল চটে না, 'হরিণ কি জীবনে হবদিন মারা যায়রে? কোন বাগ্যিবরাতে একদিন মারিছি। এতো আর ইঁদুর মারা লয়রে, যে ইচ্ছা করলাম, রোজ রোজ মারলাম।'

এ্যাহন ইঁদুর মারাও কম ঠ্যালা লয়, বুজলা – হারু থামে না। 'ফাঁদ পাত, খাওয়ার দাও, তারপরে ইঁদুর খাতে যদি আসে, তবেই গপাং করে পইড়া –।'

শুকলাল হো হো করে হেসে গলে পড়ে, 'তুই ঠিকই কইছিস, বুজলি হারু।' হাসির চোটে তার কথা ঠেকে যায়। 'খাওয়ার দিয়া আগে লোব দ্যাহান লাগে, তাইনারে – তারপরে যেই আসে, একদম ফটাস –। আচ্ছা হারু,' সে মুখটা এগিয়ে নেয়, 'তুই কিসির ফাঁদে ইঁদুর মারিস ক দেহি?'

হারু 'বাঁশের ফাঁদ' বললে শুকলাল আর একগাল হাসে, 'ঠিক ঠিক, ওডায় আরও মজা, বুজলি – বাল কইরা খাওয়ার জন্যি যেই দড়ি কাটে, সাতে সাতে লাটির ছ্যাঁচায় একদম অক্কা।'

শুনতে শুনতে খাদেমালী চুপচাপ হাসে।

বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। চাঁদহীন আকাশে অকস্মাৎ মেঘ ডাকে। ঝিঁঝিদের গানে বিরাম নেই। আজ খুপ বিষ্টি ওবিরে খাদেম, রগুগরে রেডিওত কইছে – হারুর চুপ থাকা স্বভাব নয়।

শুকলাল খেঁকিয়ে ওঠে, 'রেডিওর সব গুল, ওগরে কতা আর কইস না হারু। ওরা যেদিন কয় বিষ্টি হবি, হেদিন দিব্যি ফটফটা রোদ ওটে।'

হারু আর খাদেমালী এতে অট্টহাসিতে ডোবে। সন্ধ্যা কখন পেরিয়েছে, কেউ টের পায় না।

রাতের কাজে ছেদ পড়ে না। গাঁয়ের কোলাহল ক্রমেই থিতিয়ে পড়ে। হরিণ শিকারের গল্প আর জমে না। খাদেমালী রথখোলা দিয়ে বাড়ির দিকে এগোয়।

তখনও ঘুম ভাঙেনি খাদেমালীর।

সহসা আলো ছড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে। খাদেমালী ধড়মড় করে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আকাশের বিষণ্নতা টিপটিপ বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। মেঘের গর্জনও পিছিয়ে নেই। ঝাপসা ভবিষ্যতে সে কিছু দেখতে পায় না। ভারী হয়ে বৃষ্টি নামলে খাদেমালী মানুষের মতো স্বপ্ন দেখতেও ভুলে যায়। লাঙলের

ফলায়, কাস্তের খাঁজে, নিড়ানির আগায় অথবা রোগা বলদের কাঁধে দেখা সেইসব স্বপ্ন।

এবারও দান ডুববিগো – বউ মন্তব্য করে।

খাদেমালীর ভালো লাগে না। কিংবা ঘরপোড়া গরুর মতো ভয় পায়।

বিষ্টি যা নাবছে, মনে অয় খুপ বষ্‌ষা ওবি বাজান – বারো বছরের হ্যাবলা ছেলেটা আনমনে বলতে খাদেমালী ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়, 'তুই খোদার চ্যা বেশি জানিস, না?'

ছেলেটা ভ্যা-ভ্যা জুড়ে দেয়, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিও গতিবেগ বাড়িয়ে চলে। মা এতে বিচ্ছিরিভাবে কেঁদে মাথা ঝাঁকায়, 'আমাগরে হগলেরই গলা টিবে মার্' বলে চিল্লায়, তখন খাদেমালী চোখে সর্ষের ফুল দেখে।

বিকাল নামলে আকাশ ঘোমটা সরায়। বসে থেকে থেকে হাতপা ঝিমঝিম করছে। পোড়ানো মিষ্টি আলু গিলে খাদেমালী বেরিয়ে পড়ে। পৃথিবী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে, মাটির সোঁদা গন্ধ তা বলে দেয়। সূর্য বাইরে বেরিয়ে হাসে, অনেকটা পলাতক আসামীর মতো। চারদিকে যত্রতত্র পানির স্তূপ। মাথালটা হাতে ধরে সে হনহন করে বাঁধের উপর গিয়ে দাঁড়ায়।

বাঁধের উপর আরও জনপঞ্চাশেক লোক দাঁড়িয়ে।

মুচিপাড়ার হারুকেও একফাঁকে দেখল খাদেমালী। ভিড়ে সব একাকার। বিষ্টিতেই পানি বাড়ছে একআত – কাদের কানাঘুষা তাকে বিষাদে ডোবায়। চোখজোড়া বাঁধের উপর দিয়ে, সাবধানে হাঁটে। মাটি ধসে কস্থানে বিচ্ছিরি গর্ত। কেঁচোরা কিলবিলিয়ে ঘুরছে। একটা মেটে সাপ জান বাঁচাতে দৌড়ে পানিতে নামল।

প্রস্তাবটা প্রথম হারুই করল। বাঁধ মেরামত না করলে যে দুদিনেই মাঠ সয়লাব, একথা বেশ কৌশলে গুছিয়ে সে সবাইকে বুঝায়। ছড়ানো লোকজন এবার গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ফিসফিস গুঞ্জনেই কাটে ক'মিনিট। হাওয়ার মাতন জোরেসোরে। চাপা আলোচনা আরও ঘন হয়। একসময় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে চাষীরা গাঁয়ে ফেরে।

লক্ষ্মীছাড়া হারু ও খাদেমালী ফেরে কতক্ষণ পরে।

ঢকঢক করে পানি খেয়ে খাদেমালী বিড়ি ধরায়। ঘুমাতে না পেরে কত আকাশ-পাতাল হাতড়ায়। ক্ষুধায় নাড়িভুঁড়ি চোঁ-চোঁ। আসলে ক্ষুধা জিনিসটা আগুনের মতো, সে ভাবে – সাপের মতো জিব নাচিয়ে কেবল পোড়ায়। খরার বছর ক্ষুধায় ধুঁকেই শিবচরের কাজেমদ্দি মরল।

স্মৃতির পট খুলে যেতে চেনা মানুষের গাদাগাদি। রহিম, সাধু, নুরুদ্দি, বধ্যভূমির মতো সে পৃথিবী কঙ্কালসার মানুষে ভরতি – হাড়ে হাড়ে যাদের ধাক্কা লেগে খট খট শব্দ হয়।

চোখ বুজে সে শুয়ে পড়ে।

সাতসকালেই টুকরি-কোদাল নিয়ে বাঁধে আসে খাদেমালী। উল্লাসভরা ছুটাছুটিতে কাজ শুরু হয়। বেলা বাড়লে মানুষও ধীরেধীরে বাড়ে। রোদ ঝলমলে দিনে দারুণ উদ্দীপনা। জোর হাওয়া ওঠে। গর্ত ভরে ফাটল সারতে সারতে দুপুর হয়ে আসে। শেষবারের মতো জিরিয়ে হুঁকোয় নেশা তাড়িয়ে ওরা গাঁয়ের দিকে হাঁটে।

চারবিগা দান লাগালাম বর্গা, তাও শালা বরষা নাই – হারু আপন মনে গজগজ করে। তোর চামড়ার ব্যবসাই বাল আছিল – খাদেমালী গায়ে পড়ে উপদেশ দেয়। হারু বিগড়ে যায়, 'গরিবির শালা হব সমান, বুজলি, ঢেঁহির স্বর্গে গেলিও দানই বানা লাগে।'

খাদেমকে চালাক মনে হয় – নিজেকে গুটিয়ে নিলে কথা আর এগোয় না।

দিনটা আশ্চর্য রকম ভালো কাটল – খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে খাদেমালী ভাবল। বৃষ্টি নেই কিংবা আকাশে একচিলতে মেঘ। 'সোবহান আল্লাহ' বলে মাথা নোয়ায় সে। সজোরে একসময় 'ও খোদা' বলতে তার গলা ধরে আসে। সে জমির দিকে দৃষ্টি ঘুরায়, ধেনো জমির দিকে। সাঁ করে সিনেমার মতো একরাশ মুখ ভেসে যায় – মা, ছেলেমেয়ে, বউ।

বেলা ডুবলে খাদেমালী গোয়ালে ঢোকে।

ভনভন করছে মশা। আগুন জ্বালিয়ে সাঁজাল দেয় খাদেমালী। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় গোয়ালের নাভিশ্বাস। তার চোখে পানি ঝরলেও গরু দুটো এতক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

গামছায় হাতমুখ মুছতে মুছতে সে অন্ধকার রাস্তায় নামে।

শুকলাল গুনগুন করে কী পড়ছিল একমনে। খাদেমালীকে দেখে অমায়িক করে হাসল, 'আয় আয়, দানটান এ্যাহন কী রহমরে খাদেম?'

আল্লা তো দ্যাহাচ্ছে বালই – খাদেমালী বেঞ্চিতে বসে পড়ে।

দ্যাহায়াই তো কাম, বুজলি – শুকলাল চোখ মটকে হাসল। 'তা যাকগা, বাঁদের অবস্থা কী রহম ক দেহি?'

বাঁধের কাহিনী সে গড়গড়িয়ে বলে যায়। বৃষ্টি নামবে কিনা, নামলে কী হবে, পানি বাড়ছে কেমন, এককথায় সব। শাখা-প্রশাখার সাথে পত্রপল্লবও টেনে আনে। কাঁচামাটির ধস এবং ফাটল, তার মেরামত, হারুর চাষা বনে যাওয়া – বলতে গেলে কিছুই সে বাকি রাখে না।

শুকলাল কিছু সময় কাশে।

হরিণির গপ্পোডা কিন্তু অয় নাই শুকলালদা – নীরবতা থেকে মুক্তি চায় খাদেমালী। অথবা হরিণ শিকারের গল্পে সে বুঁদ হবার আয়োজনে মাতে।

শুকলাল হাতপা ঝেড়ে সোজা হয়ে বসে, 'ঐ দ্যাক, তোর বাঁদের গপ্পে এ্যাহাবারে বুলেই গেছিলাম।' আনন্দে সে হাসল, 'ঐ হারু, বুজলি, ওর হপ কাজেই ফোড়ন কাটা।'

আবার একটু কাশল শুকলাল।

'হেবার মনে অয় নাইনটিন ফিপটি নাইন, কেবলি মার্শাল ল জারি অইছে।'

এখনও ছিটেফোঁটা ইংরেজি রপ্ত আছে শুকলালের। বলল, 'হেই বছরই গ্যালাম হরিণ-শিকারে। দ্যাশে তহন খুপ কড়াকড়ি, কিন্তু আমার ফার্মের সায়েব আবার বিহারী, তার এক বাই আর্মির মেজর, কাজেই পরোয়াটরোয়া ছিল না সায়েবের। খুলনা যেদিন পৌঁছলাম, হেদিন রবিবার। লোকজনও বেশি না, সায়েব তো আছেই, তার এক বন্দু আর আমি। পরেরদিন আমরা নায় গ্যালাম সুন্দরবনে।'

'তোমার বয় করছিল না?' খাদেমালী কৌতূহল সামলাতে পারে না।

'বয় তো এটু করছিলই, বুজিস না। ওসপ গাঙতো শালা কুমিরের আখড়া। দেহি কি জানিস, শও শও কুমির চরে বইসা রোদ পোয়াতেছে।'

খাদেমালী এতে খুব অবাক হলে শুকলালের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়ে, 'আর কী সুন্দর সুন্দর গাছ সুন্দরবনে, হে আর কওয়ার না। তা হোন, আমরা যহন বনে ডুকলাম তহন বেলা পশ্চিমে গ্যাছে।'

হঠাৎ সে অন্য প্রসঙ্গে আসে, 'নাহ, খালি মুহি গপ্পো জমে না। ওরে ও দীনু, গোটা দুই পান দে দেহি।'

পান খেয়ে আবার শুরু করে শুকলাল, 'আমি তো ঘোড়া চিনিটিনি না কিছু, সায়েব যেদিক যায় আমিও হেদিক যাই। হ্যাষে সায়েব ক্যাওড়া গাছে উঠতে কইলে তরতর কইরা উঠলাম গাছে।'

গলা খাঁকারি দিয়ে পানের পিক ফেলে শুকলাল, 'তারপর আসল মজার কতাডা হোন। আমি উটেই সায়েবের কতামত মগডালের কচিপাতা ছিঁড়ে ফ্যালাচ্ছি, তহন সায়েব করল কি, বানরের মতো কু-কু কইরা ডাহা শুরু করল –।'

খাদেমালীর চোখ কপালে ওঠে, 'ক্যা, বানরের মতো ডাকল ক্যা?'

আরে হেডাইতো মজার গটনা, হোন আগে – শুকলাল গলা ছেড়ে হাসল। 'বানরের সাতে হরিণির আবার খুপ বন্দুত্ব। মাজে মাজে বানর ঐ রহম ডাহে আর ক্যাওড়া গাছের নরম পাতা ফ্যালায়, তা হুইনা হরিণ আসে গাছতলায় পাতা খাইতে। তাই আমরাও বানরের মতো বন্দুত্বের ভাব দ্যাহালাম – মানে এটু ছলছুতা আর কি।'

একটু দম নেয় সে, 'যাকগা, আসল কতাডা হোন। আমরা ঐ রহম করলি এটু পরেই দেহি ঝাঁক দরে হরিণ আইসা পাতা চিবাচ্ছে – তহন তো বুজতেই পারিস, সায়েব বন্দুক তুলে ফটাস ...।'

এরপরেও হরিণের বর্ণনা চলতে থাকে। হরিণটা কেমন নাদুস-নুদুস, তার রঙ কেমন, ক'সের মাংস হয়েছিল, তার স্বাদ – মোটকথা সবই এসে গল্পে ঠাঁই নেয়। 'যা তাজা হরিণ, রক্তে লাল অয়া গেছিল মাটি।'

খাদেমালী এতক্ষণে কেমন মিইয়ে পড়ে। হয়তো অযথাই দমে যায় অথবা হরিণ ডাকার চাতুরী তার ভালো লাগে না। আর জীবনে একবার মাত্র দেখা সেই চটপটে সুন্দর হরিণকে রক্তাক্ত কল্পনা করতেই তার বুক ধড়াস করে ওঠে।

আসি শুকলালদা, রাত ম্যালা অইছে – খাদেমালী উঠে পড়ল।

একটা মুরগি ধরে বনবিড়াল পালাচ্ছে, সে দেখল। পাখা ঝাপটিয়ে শেষবারের মতো কঁকিয়ে উঠল মুরগিটা। অন্ধকারেও খাদেমালী টকটকে লাল রক্ত দেখতে পায়। সে রক্ত মুরগির নয়, সম্ভবত হরিণের।

নির্ভার আকাশে কদিন রোদের ঝিকিমিকি।

আকাশের রঙ যৌবনের ঘ্রাণ আনে। ঠিক এই রঙের একটা শাড়ি (বউয়ের ভাষায় আসমানী) সে কিনে দিয়েছিল বউকে। সেসব কবেকার কথা! সে হিসাব মিলাতে পারে না। শুধু মনে আছে, তখন পৃথিবীতে সতর আর বাইশ বসন্তের দুটো যৌবন।

খাদেমালী অনেকক্ষণ আলের উপর বসে থাকে।

আউশ দু-একটা পাকতে শুরু করেছে। একজোড়া চড়াইকে সে 'হুশ' বলে তাড়িয়ে দিল। দিন পাঁচেক বাদে ধান উঠবে ঘরে, পাকা আউশ ধান, তাতানো রোদও তা ভুলতে দেয় না। কখন লাল পিঁপড়ে টুপ করে কামড় দেয় পায়ে। সে উঠে দাঁড়ায়। খালি পেটে ঘেমে নেয়েও দ্রুত পায়ে হাঁটে।

বিকালে বাঁধে আসল খাদেমালী। হারুও সঙ্গ নিতে ভোলে না।

সন্ধ্যা হলেও বসেছিল ওরা। সামনে বিলের ঢেউ খেলানো জল। ফুরফুরে জলো হাওয়ায় খাদেমালী ঢোলে। ঢুলতে ঢুলতে সে কী সব দেখে – শুকলালের মুখ এবং হরিণ, গল্পের রক্তাক্ত হরিণ। গল্পের হরিণ তাকে অনবরত পীড়া দেয়। চোখ খোলে সে। 'বুজলি হারু, আমার এ্যাটা রোগ অইছে। হেদিন হরিণ শিকারের গপ্পো হুনছি, কিন্তু বুলবার পারতেছি না।'

অবশ্য মুখ ফুটে বলা তার হয় না, হারুই নীরবতা ভাঙে, 'এবার মনে অয় মাঠটা ডুবল নারে।'

সব আল্লার ইচ্ছা হারু – কিছু না বললে নয়, তাই সে বলল।

হারু 'বগবান বাঁচাবি এবার' বলে চুপ করে।

কোলাহল আর জায়গা নিতে পারে না। একফালি চাঁদ, নক্ষত্র আর ঝকঝকে আকাশ নিয়ে ওরা বাড়ি ফেরে।

দুপুর রাতে চাঁদ ছিল না, নক্ষত্র নিভল একা একা। গাঁ তখন ঘুমিয়ে, বাদুড় আর পেঁচার গা-ঝাপটানিও শুনতে পায় না। এ সময় আলো নিভিয়ে মেঘ জমল। কালনাগিনীর মতো রাজকীয় চালে আসে মেঘ। তবে সান্ত্বনা হলো, হৈ-চৈ বাধাল না বেশি। প্রায় নাটকীয়ভাবে ঝুপঝাপ বৃষ্টি নামলে গাঁ হুড়মুড় করে জেগে উঠল।

আবার বিষ্টি আইলোরে, ও খাদেম, দ্যাখ – খুব পাতলা ঘুম মায়ের, আড়মোড়া ভেঙে সে বিছানায় বসল। ধড়মড় করে

খাদেমালী জেগে ওঠে। কিছু দেখার উপায় নেই, থকথকে আঁধারে সব ঢাকা। দুরুদুরু বুকেও সে কান খাড়া রাখে। বাতাস পড়ে যেতে গা ছেড়ে নামছে বৃষ্টি। আরও ঘন হয়ে নামলে যাত্রার বাজনার মতো লাগে।

ও খোদা, বিষ্টি থামাও গো – খাদেমালী বলতে চায়। ছনের চাল বেয়ে টুপটুপ করে পানি পড়ছে। আনমনে হাতড়িয়ে সে সানকি বসিয়ে দেয়।

এমন বৃষ্টিঝরা রাতে খাদেমালীর কেমন অদ্ভুত সখ জাগে। নক্ষত্রঘেরা চাঁদ দেখার সখ। রাতের প্রথম ভাগে যেমন দেখেছিল, কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ, তার চারদিকে মালার মতো নক্ষত্র। অবশ্য অসম্ভব জেনেও আশা ছাড়তে তার বাধে।

মা-টা একমনে গজগজ করছে।

সকালে বৃষ্টি কমে আসে। তবে ফর্সা হলেও সূর্যমুখীর বিরহ কাটে না। গোমরা আকাশ অন্তত আভাস দেয় না তেমন। বউ বসে জড়সড়। সে হাই তুলে 'ওরে আল্লা' বললে খাদেমালী পানসে চোখে তাকায়। আরও নিজের মধ্যে ডোবে মানুষটা। ধাঁ করে চোরাগলি হয়ে হরিণের কথা মনে আসে। গল্পের রক্তাক্ত হরিণ।

বৃষ্টি বাড়ল। অবিশ্রান্ত বিকারহীন বৃষ্টি।

দিনশেষে ধরে আসে বৃষ্টি। ঘনঘটায় মেঘেরা হয়রান?

এ সময় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় করে হারু আসল।

হারুকে কেমন দেখাচ্ছে – গায়ে ছিটানো কাদা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, জবার মতো লাল চোখ। 'শিগগির আয়রে, ও খাদেম, শিগগির আয়, বাঁদের অবস্থা খুব খারাপ হুনলাম – কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো ছিটকে পড়ে।

খাদেমালী এক ঝটকায় মাথাল নিয়ে নেমে আসে, উত্তেজনায় কিছু বলা হয় না।

যাস নারে, ওরে ও খাদেম, যাস না – মা মাথা কুটে মরে।

বৃষ্টি পড়ছেই টুপটাপ।

অলস সাঁঝের মতো শুয়ে আছে বাঁধটা। ফেঁপে ওঠা বর্ষা, মেঘলা আকাশ ও পোড়খাওয়া চাষী – সবার চোখ এখন বাঁধের উপর। হন্যে খাদেমালী বাঁধ দেখে – মাটি ধসে ফেটে অবসন্ন হওয়া বাঁধ। হাওয়ার দাপট বাড়ছে। হারুর চোখ পানির দিকে। পানি কি বাড়বে আরও? জবাব খুঁজতে আকাশ-পাতাল চষে ফেরে।

গুড়ুম করে আবার মেঘ ডাকল। এইমাত্র সন্ধ্যা পেরুল। মাঠের সবুজ ভূতুড়ে কালোয় ঢাকা। উদ্দাম ঢেউদের দেখা যায়, খলখলিয়ে হাসছে। চাষীদের মাঝে অসহায় উত্তেজনা। কোদাল কাঁধে কজন ঘুরছে এদিকওদিক।

আল্লার নামে একবার শেষ চেষ্টা কইরা দেহি – কোদাল নামিয়ে জমিরুদ্দি কাছা আঁটলেও গা লাগায় না কেউ। এসব এলোমেলো মন্তব্য, ঢেউয়ের গর্জন ও বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দেও খাদেমালীর বড্ড খালিখালি লাগে। হেই হরিণির কতা খালি মনে অয় – হারুকে জোর করে বলতে চেয়েও পারে না, অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ চমকে হাসলেও সগর্জনে মেঘ ডাকল।

মাটির চাপ ভাঙলে আরও দ্রুত উত্তেজনা ছড়ায়। খোদা যা করে মঙ্গলের জন্যিই করে – জমিরুদ্দি ঠায় দাঁড়িয়ে মন্তব্য করল।

হারু তাকিয়ে আছে অপলক – জলের নাচন, বাতাসের গান, আকাশের কবিত্ব, সবকিছুর দিকে। অনাড়ম্বরে হলেও বৃষ্টি ঝরছেই অবিরাম। যা হবার হবিই, বাইবা কী লাভ – বেপরোয়া হারু ঠাণ্ডায় ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। 'বাড়ি যাই লও, জানডা তাও বাঁচুক।' কেউ বাড়ি ফেরার আগ্রহ না দেখালে তার খুব আশ্চর্য লাগে।

উত্তরকোণে দাঁড়িয়ে খাদেমালী ছোট্ট পাকুড় গাছটার পাশে। অত্যন্ত বেখেয়াল ভবঘুরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। জমিরুদ্দির উক্তি প্রতিধ্বনি হয়ে কবার বাজল কানে। সে উপরে তাকায় – যেখানে খোদার সাততলা আসমান ও আরশ। এবারও একবিগা বেচা লাগবি – ভাবতেই ব্যথাটা চিনচিনিয়ে তলপেট মুচড়িয়ে বুক পর্যন্ত উঠে আসল। 'হায়রে দুক্কের জীবন, আমার বাপ-দাদাও দুক্কিই গ্যাল।' কোথাও কোন আশ্রয় না পেয়ে সে আবার আসমানের দিকে তাকাল। তবে খোদাকে (যাকে তার বাপদাদাও ডেকেছে) ডেকেও দুঃখ তার গেল না, বুকে ঢেলা হয়ে বাসা বাঁধল। দুঃখগুলো সত্যি সংক্রামক, গলাগলি করে আসে – হরিণের কথা মনে আসলে সে বুঝল।

'কী শালা কপাল, দানের জমিডাও আর দ্যাহা অইল না!' আঁধারে চোখ ফেলে সে আউশের খেত দেখতে চাইলে দাদার বারবিঘা জমি যে এখন তিনবিঘায় ঠেকেছে, সে কথা চটপট মনে আসে।

ঝড়ো বাতাসে চাপ ভাঙল আবার।

কৃষকদের উত্তেজনা 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। ঝড়ো বাতাসে ব্যস্ততা, ছুটাছুটি আর চিৎকার ভয়ার্ত রূপ নিয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল।

সরে আয় খাদেম, তোর ওপাশে ফাটল অইছে – উদভ্রান্ত হারুর গলা থরথর করে কাঁপছে।

নির্মম উদাসীনতায় একটু সরে দাঁড়াল খাদেমালী। সোঁ সোঁ ক্ষ্যাপা বাতাসে ফের ঢেউয়ের ঝাপটা লাগতে বাঁধটা কেঁপে উঠল। এইবার খোদার পৃথিবী থেকে পালাতে চাইল খাদেমালী – যে খোদা ধান দিয়েছে এবং এই তুফানের চাবিকাঠিও যার হাতে। কিন্তু তখন আর পায়ের তলায় মাটি ছিল না, অজগরের মতো গর্জন করে পানি ঢুকছিল সবুজ মাঠে।

হরিণের গল্প আর ভাবাবে না তাকে। রক্তাক্ত হরিণ এখন খাদেমালী নিজেই।

বাংলাদেশের পানিসম্পদ

আইয়ুব হোসেন

বাংলাদেশ পানিবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ, যা পরাক্রমশালী নদী গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) বেসিন বা অববাহিকার সৃষ্টি। এর প্রবাহিত এলাকা প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বর্গকিলোমিটার যার ৭.৫% বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে গিয়ে সাগরে মিলেছে। বাংলাদেশের চার-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড তৈরি হয়েছে গঙ্গা (পদ্মা)-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (বরাক) নদী সিস্টেমের মাঝে। এই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী ব্যবস্থা ৫টি দেশ যথা ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন ও বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে।

অববাহিকা-অঞ্চলে প্রায় ৩০০০ বছর বা তারও পূর্ব থেকে যে জনগোষ্ঠীর বসবাস, তার একটি অংশ ইতিহাসের নানান বাঁক অতিক্রম করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শত শত নদীর হাজার বছর ধরে বয়ে আনা পলিমাটির উর্বর সবুজ-শ্যামল ব-দ্বীপে জড়ো হয়ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নানাবিধ নৃগোষ্ঠীর মানুষ; বিচিত্র জাতের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্র জাতিগোষ্ঠী। নদীনালা, খালবিলসহ ভূ-উপরস্থ ও সহজলভ্য ভূ-গর্ভস্থ পানি এদেশের ভূমিপুত্রদের কল্যাণে ব্যবহৃত সবচেয়ে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ যা তাদের জীবন-জীবিকা ছাড়াও এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে অবিকল্প ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত দুটি প্রাকৃতিক উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকে - (ক) নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও পুকুর তথা ভূউপরস্থ জলাশয় এবং (খ) ভূগর্ভস্থ পানি যা গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। এছাড়া আরেকটি অপ্রধান উৎস হিসেবে রয়েছে বৃষ্টির পানি। এক্ষেত্রে দুটি প্রধান উৎসের প্রথমটির ওপর দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

দেশের প্রায় সকল অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া শিরা-উপশিরার মতো নদীনালাগুলো এদেশের বর্তমান ভূচিত্র রচনায় সহায়ক হয়েছে। এজন্যেই বাংলাদেশকে নদীমাতৃক বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রতিটি নদীই নির্দিষ্ট অঞ্চলে তার নিজস্ব অবদানের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় অভিষিক্ত। জীবনের জন্য অপরিহার্যতা বিবেচনায় ভালোবেসে নদ-নদীগুলোকে দেওয়া হয়েছে অসাধারণ সুন্দর সুন্দর নাম – আত্রাই, আড়িয়াল খাঁ, কপোতাক্ষ, করতোয়া, কর্ণফুলী, কাঁকন, কীর্তনখোলা, কীর্তিনাশা, কুশিয়ারা, খোয়াই, গড়াই, চিত্রা, জলঢাকা, ডাকাতিয়া, তিতাস, তিস্তা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, ধানসিঁড়ি, নাফ, পশুর, পদ্মা, পাহাড়ীয়া, পুনর্ভবা, ফেনী, বড়াল, ব্রহ্মপুত্র, বাঙালি, বালু, বিরিশিরি, বুড়িগঙ্গা, ভৈরব, মধুমতী, মনু, মহানন্দা, ময়ূর, মাতামুহুরী, মুহুরী, মেঘনা, যমুনা, রূপসা, শঙ্খ, শিবসা, শীতলক্ষ্যা, সাঙ্গু, সুরমা, হালদা ইত্যাদি অন্যতম।

বাংলাপিডিয়া ও মাধ্যমিক ভূগোল গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যানুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত নদনদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর সূত্রমতে এ সংখ্যা ৩১০টি। আবার কোথাও উল্লেখ রয়েছে ২৩০টি নদীর কথা। তবে সংখ্যা যাইহোক, ২৪,১৪০ কিলোমিটার (বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এ নদীগুলো ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা, সুরমা-মেঘনা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদীসমূহ - এ ৪টি নদীব্যবস্থায় বিভক্ত। বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি, বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম খাত কৃষি পুরোপুরি এদেশের সহজলভ্য নদীনালার পানির ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির অপরিহার্য খাত শিল্প-কলকারখানাগুলো তাদের পণ্য পরিবহন ও উৎপাদনে প্রধানত নদীনালার ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে স্মরণাতীতকাল থেকে এদেশের মানুষের প্রাণীজ আমিষের প্রধান উৎস, বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবিকার উৎস ও অন্যতম রপ্তানিখাত মৎস্যসম্পদ এদেশের নদীনালার ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে নদীনালা দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানুষের পাশাপাশি হাজার প্রজাতির পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় প্রভৃতির জীবনযাত্রা নদীকে আশ্রয় করে। এমনকি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূগর্ভস্থ পানিতে মরণঘাতী আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষের সুপেয় পানির প্রধান আধার হিসেবে অপরিসীম ভূমিকা পালন করছে এদেশের নদ-নদী। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী পানির তীব্র চাহিদা বৃদ্ধি এবং এলক্ষ্যে শুরু হওয়া পানি-রাজনীতির শিকার হয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে নদীর সঙ্গে এদেশের অধিবাসীদের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটতে শুরু করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পানি প্রবাহের শতকরা ৯০ ভাগ পানির উৎস বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত। এদেশের ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে ৫৪টির প্রবাহ আসে ভারত হয়ে এবং ৩টি আসে মায়ানমার হয়ে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশে স্বাদু পানির যে প্রবাহ তা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদী প্রবাহ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কোনো কারণে এসকল নদ-নদী শুকিয়ে গেলে গোটা দেশটিই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। আর এ আশংকা এদেশের মানুষের মনে এখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

কেননা, পৃথিবীর মোট আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ পানিবেষ্টিত হলেও মানুষের ব্যবহারযোগ্য পানির পরিমাণ খুব বেশি নয়। এক হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের মোট প্রাক্কলিত পানির পরিমাণ ১৩৮৬ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। এর শতকরা ৯৬.৫ ভাগ তথা ১৩৪০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানির উৎস সমুদ্র। সমুদ্রের এ পানি লবণাক্ত এবং মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও কৃষিক্ষেত্রে

ব্যবহারের অনুপযোগী। অন্যদিকে, মিঠাপানির পরিমাণ মাত্র ২ দশমিক ৫ শতাংশ বা ৩৫ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। কিন্তু এরমধ্যে ২৪.৪ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার তথা পানযোগ্য এ সামান্য পরিমাণ পানির দুই-তৃতীয়াংশ আবার মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে হিমবাহ এবং মেরু অঞ্চলে জমাট বরফ অবস্থায় রয়েছে। অবশিষ্ট ১০.৬ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানি সুপেয়, যা পৃথিবীর মোট পানিসম্পদের শতকরা ০.৭৬ ভাগ মাত্র। এরমধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য অংশ জনবসতি থেকে এতদূরে যে তার নাগাল পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে যত পানি রয়েছে তার মাত্র ০.০৮ শতাংশ পরিমাণ পানি মানুষের ব্যবহারের আওতায় রয়েছে। অর্থাৎ পানি একটি সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কোনোভাবেই প্রকৃতির অন্তহীন দান হিসেবে পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের অবকাশ নেই। তাই বর্তমান শতকে জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি অপর যে সমস্যাটি বিশ্ববাসীর সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তা হচ্ছে নিরাপদ পানি।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে প্রচণ্ড পানি সংকট দেখা দেবে। এসময় পৃথিবীর মোট ৯৩০ কোটির ৭০০ কোটি মানুষই নিরাপদ পানির সমস্যায় পড়বে। এখনই বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ হয় পর্যাপ্ত পানি পায় না অথবা তাদের কাছে নিরাপদ পানি পৌঁছায় না। অন্যদিকে, অপরিশোধিত বা অনিরাপদ পানি প্রতিবছর ২০ থেকে ২২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন ৩০ হাজার শিশু তাদের পঞ্চম বর্ষে পা রাখার আগেই পৃথিবী থেকে দুঃখজনকভাবে বিদায় নিচ্ছে।

পানি যেহেতু মানুষের জীবন, জীবিকা ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক একটি উপাদান, সেহেতু নিরাপদ পানি প্রাপ্তি একটি মৌলিক মানবাধিকার। এই প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে সারা বিশ্বে এটি এখন কৌশলগত প্রাকৃতিক উৎসে পরিণত হয়েছে। পানির প্রাপ্যতা ক্রমেই কমে যাওয়ায় এবং চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে তেলের মত গুরুত্ব বহন করবে পানি। ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরাজেল্ডিন বলেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধের মূল কারণ যদি হয়ে থাকে তেল, তাহলে একুশ শতকে যুদ্ধের কারণ হবে পানি।' কেননা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে পানির ব্যবহার বাড়বে, সুপেয় পানির অভাব সৃষ্টি হবে। এর ফলে উজানের দেশগুলো পানি ব্যবহারের ওপর কর্তৃত্ব করার প্রচেষ্টায় নদ-নদীর পানি প্রত্যাহার করা শুরু করবে। এতে উপকূলীয় দেশগুলোতে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এ লবণাক্ত পানি ব্যবহার উপযোগী নয় বলে মিঠা পানি নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়বে।

অন্যদিকে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় পানি-রাজনীতিতে শক্তিমত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকার পাশাপাশি দেশটি তার অভ্যন্তর ভাগে বিরাজিত জলাধারগুলো সংরক্ষণ ও সেগুলোর কার্যকর ব্যবহারেও উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে গিয়ে শহর ও উপশহরের চারিদিকে বিদ্যমান জলাধারগুলো অপরিকল্পিতভাবে ভরাট করে যেমন গড়ে উঠছে আবাসনপ্রকল্প, তেমনি একইরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কুপ্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ভরাট করা হচ্ছে। শহরগুলোর পার্শ্ববর্তী নদীনালার দুই পাড়। একইভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের বিদ্যমান নীতিমালা ও আইন-কানুনকে তোয়াক্কা না করে কলকারখানাগুলো তাদের শিল্পবর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত করছে শহর-সন্নিকটের খাল-বিল নদী-নালাকে।

বুড়িগঙ্গাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজধানী শহর ঢাকা তার নাগরিকদের মলমূত্র, আবর্জনা, ও শিল্প-রাসায়নিক বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত করেছে নদীটিকে। ওয়াসার সূত্রমতে, রাজধানী ঢাকার ৮২ শতাংশ মানুষের মলমূত্র মিশছে বুড়িগঙ্গায়। এরসঙ্গে রয়েছে গৃহস্থালী ও শিল্প বর্জ্য। প্রতিদিন রাজধানীর বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের ৪৯ শতাংশ ফেলা হচ্ছে বুড়িগঙ্গায়। সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা ও শিল্প কারখানার বর্জ্য বহন করতে গিয়ে বুড়িগঙ্গা মারাত্মক দূষণের শিকার হয়েছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, প্রতিদিন হাজারীবাগ শিল্পাঞ্চল থেকে ১৬ হাজার ঘনলিটার, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থেকে ৩ হাজার ৭ শ ঘনলিটার দূষিত বর্জ্যমিশ্রিত পানি রাজধানীর নদীগুলোতে মিশ্রিত হচ্ছে। শিহরিত হওয়ার বিষয়, এই নদীর পানি এখন এতটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে যে এ পানিতে কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। বুড়িগঙ্গা নদীর বুকেই নাকি ১০ ফুট পুরু পলিথিনের স্তর পড়েছে! ঢাকার পার্শ্ববর্তী শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বালু আর তুরাগেরও প্রায় সমদশা। শুধু বুড়িগঙ্গা নয় তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং বালু নদীর তীর ধরে গড়ে উঠেছে বেশুমার শিল্প-কারখানা। শত শত কল-কারখানার শিল্পবর্জ্য আর কয়েক লাখ মানুষের নর্দমার ময়লায় শীতলক্ষ্যা ইতোমধ্যে বিষাক্ত বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। বালু নদী একসময় রাজধানী ঢাকার পূর্বপার্শ্বে প্রবাহিত হলেও এখন তাকে আর নদী হিসেবে চিহ্নিত করার উপায় নেই। এখন এর তীরে দাঁড়ালে চোখে পড়বে ময়লা পানিতে ভরপুর ডোবা। পানিশূন্য এ নদীর মাঝবরাবর রাস্তা নির্মিত হয়েছে যা মিলিত হয়েছে আরেকটি সদ্যনির্মিত রাস্তার সঙ্গে। এ রাস্তাটি চলে গেছে বনশ্রী আবাসিক প্রকল্পের দিকে। তুরাগ আর ধলেশ্বরী নদীর অবস্থাও তথৈবচ। কখনো কখনো সরকারি তরফ থেকে এসকল নদী-নালাকেন্দ্রিক অবৈধ জবর-দখল উচ্ছেদকল্পে অভিযান চালানো হলেও কিছুদিন স্থিরাবস্থার পর পুনরায় বিপুল উদ্যমে দখলপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে ২০০৭-এর জুন পর্যন্ত ১৩ দফায় বুড়িগঙ্গা-তুরাগ-শীতলক্ষ্যা নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হলেও পরবর্তীতে নদী-খেকোরা বেশিরভাগ উদ্ধারকৃত জায়গা আবার দখল করে নেয়। অন্যদিকে, কলকারখানা আর মানুষসৃষ্ট বর্জ্যের ভয়াবহ দূষণে অত্যাধুনিক পানি-পরিশোধন প্লান্টেও এসকল নদীর পানি বিশুদ্ধ করা দুরূহ হয়েছে; বিশুদ্ধ করার পরও পানিতে দুর্গন্ধ থেকে যায়। এমনকি পানির দুর্গন্ধে নদীর পাড়ে বাস করাও কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

একইরকম না হলেও ভিন্নতর করুণ বাস্তবতার মুখোমুখি ঢাকার বাইরের এবং সারাদেশের অধিকাংশ প্রধান নদীগুলো। প্রবল প্রবহমানতার কারণে প্রমত্ত উপাধিধারী দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী পদ্মা। পদ্মা ও মেঘনার মিলিত প্রবাহটি মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙ্গনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয়েছে বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। কিন্তু বর্তমানে প্রমত্তা পদ্মার সেই রূপ আর নেই। ক্রমাগত পলি জমে নদীর বিভিন্ন স্থানে (বিশেষ করে রাজশাহীতে) অনেক স্থায়ী চরের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে পানির প্রবাহ ও মাছের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য কমে যাচ্ছে। এছাড়া নদীর বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ মাছ ধরার জাল (কারেন্ট জাল) ব্যবহার করে ছোট-বড় সব ধরনের মাছ আহরণের ফলেও মাছের উৎপাদনের ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়ছে। প্রস্তাবিত ১ম ও ২য় পদ্মাসেতু নির্মিত হলেও যমুনার মতো নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তিস্তার পানি প্রবাহ এ এযাবতকালের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। তিস্তা ব্যারাজ থেকে দেড়শ কিলোমিটার পর্যন্ত নদী এখন স্রোত না থাকায় মরা গাঙে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে তিস্তার উজানে গজলডোবা নামক স্থানে ভারত একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে তিস্তার দুর্বার গতিকে থামিয়ে দেয়। বছরের পর বছর অববাহিকায় গড়ে ওঠা সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্মৃতি নিয়ে বয়ে চলা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রমত্ত চিত্রা নদীও আজ তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। কিশোরগঞ্জের ভৈরব এবং যশোরের কপোতাক্ষ থেকে বের হওয়া নদীগুলোয় বর্ষার কয়েক মাস পানি থাকে, বাকি সময় শুকিয়ে যায়। আর নদী শুকিয়ে যাওয়ায় মানুষ নদীর দু তীর দখল করে বসতবাড়ি-মার্কেট তৈরি করছে। কাপ্তাই লেকের পানি কমতে থাকায় ও অবৈধ দখলের কারণে হুমকিতে পড়েছে কর্ণফুলী। এসব নদীর উজানে বাধার কারণে বিপর্যয় নেমে এসেছে ভাটি অঞ্চলে।

বিআইডব্লিউটিএ নদী সংরক্ষণ বিভাগের হিসেব মতে, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ২৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ ছিল যা বিভিন্ন কারণে হ্রাস পেতে পেতে এখন প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটারে এসে পৌঁছেছে। শুষ্ক মৌসুমে নদীপথের এ দৈর্ঘ্য কমে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৮০০ কিলোমিটারে। এ পরিমাণ ফি-বছর আরও কমে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। কেননা গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা (বরাক) এই তিনটি বড় এবং প্রধান নদ-নদীসহ যে ৫৪টি ছোট-মাঝারি নদী ভারত থেকে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে, তারমধ্যে ৪৮টি নদীর পানি প্রবাহকে ভারত নানা প্রক্রিয়ায় এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। সীমান্ত নদীর উজানে পানি প্রবাহে বাধার কারণে বিপর্যস্ত ভাটির দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো। পানির অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদী মরে যাচ্ছে। বর্ষায় নদীগুলোতে পলি পড়ে ভরাট হচ্ছে এবং নাব্যতা হারানোর ফলে বছর বছর বন্যা দেখা দিচ্ছে। অধিকাংশ নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়ায় মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, মৎস্যসম্পদ, নৌপরিহন ও আবহাওয়া-পরিবেশে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলাশয় ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালার তোয়াক্কা না করে ভারত ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তা ব্যারেজ, চলমান টিপাইমুখ বাঁধ এবং প্রস্তাবিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পসহ বিভিন্ন বৈষম্যমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে শুকনো মৌসুমে গঙ্গা অববাহিকার নদ-নদী খালবিলগুলো ইতোমধ্যে শুকিয়ে গেছে। প্রবাহশূন্য হয়ে পড়েছে মহানন্দা, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, বেতনা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইছামতির মতো বড় বড় নদীগুলো। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকার প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রে এখন পর্যন্ত কোনো বাঁধ নেই। কিন্তু শুকনো মৌসুমে চীন ও ভারত অসংখ্য পাম্প বসিয়ে এই নদীর পানি টেনে নেয়। ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ কমে আসে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনাতে।

ভূ-উপরস্থ পানির সহজলভ্যতার মতো ভূগর্ভেও সহজলভ্য মিঠা পানির দেশ হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে আজকাল গভীর নলকূপও বিশুদ্ধ পানির যোগান দিতে পারছে না। কেননা, নদ-নদীর পানি সহজলভ্য না থাকায় মানুষ তার প্রয়োজনে দৈনন্দিন ব্যবহার ছাড়াও কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে আসছে। ফলে স্বভাবতই পানির স্তর নিচে চলে গেছে এবং সেখানে আর্সেনিকের উপস্থিতি পানির দূষণ ঘটাচ্ছে।

অন্যদিকে, সমুদ্র সমতল হতে গড়ে মাত্র ১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বাংলাদেশের বিস্তৃত সমতল ভূমির নদ-নদীগুলোতে পানি স্বল্পতার কারণে সেখানে জোয়ার-ভাটার টানে বঙ্গোপসাগর থেকে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে। মিঠাপানির অভাবে হুমকিতে পড়েছে বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্ব-ঐতিহ্য সুন্দরবন। সুন্দরবনসহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী ও বর্ষায় কৃষিজমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে।

অবশ্য আশার কথা হচ্ছে, প্রতিবেশী দেশ ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারসহ নানাবিধ অন্যায্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের মানুষ সচেতন হয়ে উঠছেন। পাশাপাশি, নদী রক্ষায় সরকার কিছু কিছু নদী খননের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এরমধ্যে কুষ্টিয়ায় গড়াইসহ কিছু নদীর খননকাজ শুরু হয়েছে। তবে খনন করে নদী রক্ষা করা সম্ভব বলে সাধারণ অভিমত প্রচলিত থাকলেও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, পানির প্রবাহ না থাকলে খননের মাধ্যমে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। নদী খননের নামে অর্থ বরাদ্দ করে লুটপাট করাই নদী খননের মূল উদ্দেশ্য বলে সকলে মনে করেন। তাঁদের মতে, দেশকে বাঁচাতে হলে একাধারে নদ-নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে এবং নদ-নদীসহ দেশের অন্যান্য জলাশয় দখলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা, নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীই হচ্ছে দেশবাসীর প্রাণপ্রবাহ।

প্রতিশ্রুতিশীল অভিনেতা ও নাট্যকার বরুণ

আলাউল হোসেন

আনিসুল হক বরুণ মঞ্চ এবং টেলিভিশন নাটকের অভিনেতা। টিভি নাটকে অভিনয় করে অল্পদিনেই দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। মঞ্চ নাটকে অভিনয় ছাড়াও কোরিওগ্রাফি এবং নির্দেশনায়ও তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

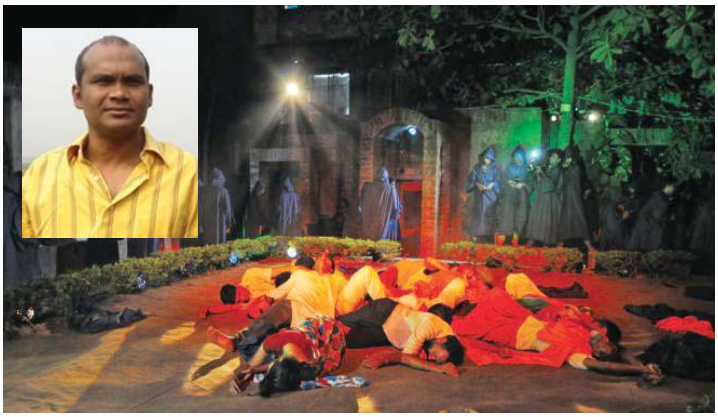

শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ যুদ্ধপুরাণ

কবিতা লিখেছেন: 'ইন্দ্রের মন্দিরে ঘণ্টা বাজার পর যতদূর তাকাই/ ঘন, আরো ঘন কুয়াশা/ তার ওপারেও সভ্যতা হবে একদিন/ কেবল শুশ্রূষার কাছে নতি শিকার/ শিকারী পুরুষের'। শব্দকে ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে দেয়ার চমৎকারিত্ব, পঙক্তিগুলোকে এক ধরনের রহস্যময়তা ছিন্ন করে আরেক রহস্যে পৌঁছে দেবার এক অদ্ভুত কুশলতা এবং ছন্দ প্রয়োগের দক্ষতা তার কবিতার শরীরকে করে কারুকার্যময়।

বরুণ পাবনার গোপাল চন্দ্র ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৮৭ সালে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পাশ করে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে এইচএসসি ও স্নাতক শেষ করেন। ১৯৯৪-৯৫ সেশনে ভারতে NIFA–তে ফিল্ম বিষয়ে লেখাপড়া করেন এবং পরবর্তীতে ঢাকার শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

খুবই বন্ধুবৎসল, আড্ডাপ্রিয় বরুণের ছোটবেলা থেকেই শিল্প-সাহিত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে তার সহপাঠিদের নিয়ে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের গল্পকে নাটক বানিয়ে মঞ্চায়ন করতেন তাদের বাড়ির উঠানে। ১৯৮৭ সাল থেকে বরুণ থিয়েটার করছেন; যান্ত্রিক নাট্যগোষ্ঠীর 'ঈশ্বর ফিরে যাও' দিয়ে তার হাতেখড়ি। তারপর কারক নাট্য সম্প্রদায়, অনুশীলন আশি, নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায় এবং সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার হয়ে বর্তমানে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে নিয়মিত কাজ করছেন। সেই সাথে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের অডিওভিজুয়াল আর্কাইভ এবং ডকুমেন্টেশন বিভাগের দায়িত্বে কর্মরত আছেন।

মঞ্চে অভিনীত বরুণের উল্লেখযোগ্য নাটক টিয়া পক্ষি সমাচার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, এই দেশে এই বেশে, ফেরারী নিশান, সাত ঘাটের কানাকড়ি, বিক্রমবর্ষ, বেহুলা সুন্দরী, রাজা, পীরচাঁন, পুতুলের ইতিকথা, উরুভঙ্গম, কালসন্ধ্যা, ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিদা, রক্তকরবী, এখন দুঃসময় ইত্যাদি।

বরুণের নির্দেশিত নাটক তবু কেন, গানের পাখি, তাড়ক, পরিচয় ইত্যাদি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ২০১৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রযোজিত তার ভাবনায় ও নির্দেশনায় এক ব্যতিক্রম প্রযোজনা 'যুদ্ধপুরাণ'। যেখানে অভিনেতারা কেউই জীবিত নন সবাই মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ। এই নাটকে দর্শকরা শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করতে বদ্ধভূমিতে আসেন এবং শহিদরা তাদের আপ্যায়ন করেন, ঘুরে ঘুরে ৭১ সালে উনারা কী ভাবে শহিদ হয়েছিলেন, কাকে কোথায় হত্যা করা হয়েছিলো সেইসব জায়গা চিনিয়ে দিয়ে দর্শকের মনে যখন প্রশ্নের ঝড় চলছে তখন এক পর্যায়ে দর্শকদের বিদায় দেন শহিদেরা।

বরুণকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রথম দেখা গিয়েছিলো ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) পাবনা জেলার আঞ্চলিক নাটক 'বিয়ের গল্প'-এ। ২০০৭ সাল থেকে নিয়মিত হতে দেখা যায় তাকে। বৃন্দাবন দাসের রচনা এবং সালাহউদ্দিন লাভলুর পরিচালনায় 'সাকিন সারিসুরি' নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার টিভি নাটকে আসা। ইতোমধ্যে অসংখ্য একক ও ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক: সাকিন সারিসুরি, হাড়কিপটে, জবের ব্যাপার, আলতা সুন্দরী, সালিশ সমাচার, ঘোড়, জামাইমেলা, লংমার্চ, গুক্কু, সম্পর্ক, স্কেচ, চোরকাব্য, জিরো পয়েন্ট ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা থেকে বরুণ শিখেছেন। তিনি নিজেও অনেক কর্মশালা পরিচালনা করেছেন। অংশগ্রহণ করেছেন দেশ-বিদেশের নানা নাট্যোৎসবে। সর্বোপরি আনিসুল হক বরুণ একজন প্রতিশ্রুতিশীল কবি এবং অভিনেতা। চলচ্চিত্র নির্মাণে তার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। থিয়েটার নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। তিনি মনে করেন জেলা শহরগুলোতে থিয়েটার করা সম্ভব হলেই বাংলাদেশের থিয়েটার সমৃদ্ধ হবে।

বসন্তের এক শনিবারে

আশরাফ আহমেদ

ভার্জিনিয়ার সেনানডোহ ন্যাশনাল পার্ক। চারিদিকে নিস্তাপ-আগুন লাগানো গাছের রঙিন পাতা ও তার ঝরে যাওয়া দেখতে সাধারণত যাওয়া হয় হেমন্তের প্রহরে। এবার গিয়েছিলাম আলস্যে দেখা দেয়া বসন্তের শুরুতে, এক শনিবারে। পাতা গজানো দেখতে।

মৃত্তিকা তার শীতের ধূসরতা কাটিয়ে সবুজ হব-হব করছে। পাতাবিহীন গাছে নতুন কুঁড়ি মেলতে শুরু করেছে। হয়তো ঘোমটার নীচে সেই কুঁড়িকে দেখতে পেয়ে পবনদেব সেদিন উতলা হয়েছিল। নতুন জীবনের সৌন্দর্য সে শুধু নিজেই উপভোগ করতে চায়। অন্য কারো সান্নিধ্য কাম্য নয়। তাই তাপমাত্রা সহনীয় হলেও প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট ওপরে প্রচণ্ড বাতাস শরীরে শুধু কাঁপুনিই ধরিয়ে দেয়নি। মনে হচ্ছিল শুকনো পাতার মতোই আমাদের উড়িয়ে, তাড়িয়ে দেবে! ফলে কিছুক্ষণ পরেই চলে এসেছিলাম। সাথে ছিল নিউইয়র্ক থেকে বেড়াতে আসা দুই নাতনি সহ আমাদের ভাগ্নি শম্পা ও তার স্বামী। মূলত ওদের উৎসাহেই এখানে আসা।

খাড়া পাহাড় থেকে ঘণ্টা দেড়েক আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে কিছুটা সমতলে নেমে এক বাড়িতে ঢুকলাম। এখানে দিগন্তজুড়ে মাঠে শুধুই সবুজ ঘাস। সাথে থাকা আমার শ্যালকের পুরনো প্রতিবেশি এই বাড়ির ভাড়াটে। ডানে, বাঁয়ে ও পেছনে তিনটি বিশাল খামার পরিবেষ্টিত প্রায় পাঁচ একরের এই 'ছোট' বাড়িটি বানানো হয়েছিল ১৮৫০ সালে। আধুনিকতা বিবর্জিত, প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনযাপনের ইচ্ছায় ওরা এখানে বাসা নিয়েছেন।

আমেরিকায় পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত না করে দুধ বিক্রি করা বেআইনি। তাই ওরা গ্রামের অনেকের সাথে মিলে একটি গরু 'কিনেছেন'। মানে, এক কৃষককে এককালীন ষাট ডলার দিয়ে একটি গরুর দুধের অংশীদার হয়েছেন। তেমন দুটো হোলস্টাইন ফ্রেইজিয়ান গরু ঘাস খাওয়া ভুলে অবাক বিস্ময়ে আমাদের দেখছিল। গ্রামের ছেলেরা খেলা ফেলে শহুরে আগন্তুককে যেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, ঠিক তেমনিভাবে। আমি কাছে গেলে দূরে সরে গিয়ে আবার ফিরে আসছিল। আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। প্রাণিজগতে গরুই সম্ভবত সবচেয়ে নিরীহ শান্ত, কিন্তু পরোপকারী!

গরুগুলো মাঠে চরে শুধু জৈব বা অরগানিক ঘাস ও খড় খেয়েই বড় হয়েছে ও বেঁচে থাকছে। মালিক এখন প্রতি সপ্তাহে তিরিশ ডলারের বিনিময়ে পাঁচ গ্যালন খাঁটি দুধ পান। বাংলাদেশে আমরা যেমন দুধ জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে পান করি, তার বদলে ওরা এই 'কাঁচা' দুধই পান করেন। মালিক তার নিজের গরুর দুধ যেভাবে ইচ্ছা খাবে। এখানে রাষ্ট্রের আইনের বাধা দেয়ার কিছু নেই! অতিথি হিসেবে আমরাও এই কাঁচা দুধের স্বাদ নিলাম – অপূর্ব, হালকা মিষ্টি, আইসক্রিমের মত!

ঠান্ডায় রেখে দেয়া দুধের বোতলে স্নেহটি ওপরে এসে দেখা দিল। চোখে দেখলেও আমার ক্যামেরার লেন্সে তৈলাক্ত স্নেহ থেকে জলজ দুধকে আলাদা করতে পারলাম না। কিন্তু এ বাড়ির ছোট ছেলেটি একটি বোতল মিনিট কয়েক ঝাঁকিয়ে খাঁটি এক টুকরা স্নেহ আলাদা করে ফেললো।

বাংলাদেশে এভাবে আলাদা করা দুধের স্নেহকে ননী বলা হয় জানতাম। মাত্র দুইশ মিলিলিটার দুধ থেকে হলুদ রঙের অনেকটাই ননী পাওয়া গেল। গরুটি যে মাঠে চরে সবুজ ঘাস খায় তা বোঝা গেল এই সুন্দর হলুদ রঙ থেকে। রঙটি বেটা-ক্যারোটিনের যা থেকে ভাইটামিন-এ তৈরি হয়, আমাদের দৃষ্টিশক্তির একটি আবশ্যিক উপাদান।

বাড়ির উঠানে একটি খোঁয়াড়ে ছয়টি স্বাস্থ্যবতী মুরগি। কোন মোরগ নেই। তিনমাস বয়েসি জিঞ্জারনাট রেঞ্জার জাতের শঙ্কর ছানা কিনে এনেছিলেন। আরো তিনমাস না যেতেই ওরা প্রত্যেকে একটি করে ডিম দিয়ে যাচ্ছে প্রতি ভোরে। একবছরে একদিনের জন্যও কেউ ভুল করেনি। প্রতিদান হিসাবে মালিক ওদের মজার খাবার দেন দুবেলা। তাজা সবজি টুকরো করে সালাদ এবং ওটমিলের স্ন্যাক দিতেও ভোলেন না। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য উঠানে, পুকুর পাড়ে ছুটাছুটি, গোল্লাছুট ও কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলতে দেন। নীচে উঠানের ঘাস খেয়ে শেষ করে ফেললে প্রতি সপ্তাহে একবার খোঁয়াড়ের স্থান পরিবর্তন করে দেন। তেমনি সপ্তাহে একবার পুরনো ময়লাটি ফেলে নতুন লেপ-তোষকের বিছানাও বিছিয়ে দেন। ওদের লেপ-তোষক হচ্ছে কাগজের মত করে চাঁছা ওক গাছের মসৃণ কাঠের খোসা। বাড়ির সবাই মিলে ওদের খুব আদর করে। ফলে মানুষকে একেবারেই ভয় পায় না ওরা। সহজেই কোলে এসে আদর নেয়। অসম্ভব কোমল-মসৃণ পালকে হাত বুলালে সেই হাত আর উঠে আসতে চায় না!

প্রত্যেকে বছরে ৩৬৫টি স্বাস্থ্যবান ডিম দিলেও কোনটি থেকেই বংশধর জন্ম নেয়নি আজো, জন্ম নেবেও না! তাদের গলায় বিশেষ এক নিম্নস্বরে সেই আক্ষেপই যেন ফুটে ওঠে! তবুও স্বর্গের অপ্সরীর মত কুমারী হয়ে চিরটি জীবন এভাবে আমাদের সেবা করেই কাটিয়ে দেবে। এটিই স্বর্গের, বিধাতার পবিত্র বিধান!

বাড়ির চার বছর বয়েসি একমাত্র কন্যাটি একমনে খেলে যাচ্ছে। কখনো গিয়ে একটি মুরগিকে কোলে নিয়ে আদর। কখনো গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটিতে পানি মিশিয়ে কাদার কেক বানায়। পৃথিবীর কোন শব্দ, কোন আহ্বান এখন আর ওর কানে পৌঁছায় না। সবচে মজার একটি কেক বানাতে পারলেই শুধু উপাসনা ভাঙবে। কতকাল আগে কাদামাটি নিয়ে খেলেছিলাম, এতো মনোযোগ দিয়ে কোন কাজ করেছিলাম চেষ্টা করেও তা স্মরণ করতে পারলাম না।

ফেরার সময় গ্রামের কাদামাখা মেঠো পথটি ভেজা, উদাসী চোখে তাকিয়েছিল। সাথে আকাশে-বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের এক করুণ সুর বেজে উঠেছিল! কিন্তু যেতে হবে ফিরে। বসন্তের এক শনিবারে।

৬ এপ্রিল ২০১৫, পটোম্যাক, মেরিল্যান্ড

লেখক আমেরিকা-প্রবাসী বাংলাদেশের প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে আমেরিকার একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে গবেষণার কাজ করছেন।

মাতৃভাষায়
বিজ্ঞানচর্চার
প্রসার হোক